॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

---

স্বদেশী যুগ

ও

সমকালীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের রচিত সাহিত্য

---

## ॥ রাজনৈতিক পরিমন্ডল ও বঙ্গভঙ্গ ॥

উনবিংশ শতকের নবজাগরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী উদ্বেলিত হয়েছিল রাজনৈতিক ধারণা। উনবিংশ শতক প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ ভাষা প্রকাশিকা সভা (১৮৩৬), জমিদার সভা (১৮৩৮), ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৩৯), বেঙ্গলী ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩), ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন (১৮৫১), ভারত সভা ও জাতীয় কংগ্রেসের মাইল স্টোনগুলো একের পর এক অতিক্রম করে জনচিত্ত দুবার হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রও ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছিল। সমকালীন রাজনৈতিক পরিমন্ডলের বৈশিষ্ট্যই ছিল রাজনৈতিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ, গণ - আন্দোলনের বিস্তার, সাহিত্য চর্চা বা সাহিত্যে রাজনৈতিক ভাবনার প্রতিফলন ও বৈদেশিক শাসনের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে মধ্য বিত্ত শ্রেনীর মধ্য হতে উঠে এসেছিল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। প্রথমে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রসারের মধ্য হতে মধ্য বিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। এর ফলে সাহিত্যে, সংবাদ পত্রে সর্বত্র জাতীয়তাবাদের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল তার রূপকার ছিলেন এই মধ্য বিত্ত সম্প্রদায়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব হতেই গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন। পরাধীন দেশের একটি সার্বজনীন লক্ষ্য বা ধ্যেয় বোধ থাকে। পরাধীন ভারতে এই ধ্যেয় বোধের নাম ছিল দেশ-প্রেম। পরে এই ধ্যেয়র লক্ষ্য পূর্তির নাম হলো স্বাধীনতা।

তাই উনবিংশ বিংশ শতাব্দীর নেতৃবৃন্দের কাজ ছিল পরাধীন জাতীয় চৈতন্য - বোধকে জাগিয়ে তোলা। এই কার্যে সকল শ্রেনীর মধ্যবিত্ত যারা যে কোন পেশায় নিযুক্ত থাকুক না কেন তাদের পেশার সাথে জড়িয়ে ছিল ভারতের স্বাধীনতার আবকাঙ্খা। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজস্ব দৃষ্টিকোণ নিয়ে পরাধীনতার হাত থেকে ভারতকে

নতুন আলোকে নিয়ে আসার পথ খুঁজেছেন । তাঁরা অনুভব করেছেন ভারতের দুর্বলতা । জাতিকে জাগাবার সঞ্জীবনী মন্ত্র তাঁদের কাছে ছিল । তাই স্বদেশ ভাবনাকে তীব্র করার প্রেরণা আত্ম তাগিদেই তাঁরা অনুভব করেছিলেন । তাঁদের রচিত গ্রন্থগুলি বহুদিন যাবৎ আপামর দেশবাসীকে জীবন জাগরণের গান শুনিয়ে এসেছিল ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল তাতে যেমন তদানীন্তন নেতৃবৃন্দের রচিত সাহিত্য আন্দোলন মুখী জনতাকে চলার পথের যেমন পাথেয় ছিল তেমনি এই সাহিত্য বলজয়ী হয়ে স্বাধীনতার উদ্দীপনায় ওতপ্রোত ভাবে মিশে গেল । এমন কিছু সাহিত্যিক দার্শনিক, সন্ন্যাসী বা দেশ - নেতা যারা বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন স্বদেশী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উদ্বেল জন সমাজের কাছে তাঁদের রচিত সাহিত্যও অনুপ্রেরণার বিষয় বস্তু হয়ে দাঁড়াল । আর যাঁরা এই আন্দোলনকে পরিচালনা করছিলেন তাঁদের রচিত সাহিত্যেও আনল জাতীয়তাবাদের প্রাঙ্গনে স্বদেশী আন্দোলনের ফল্গুধারা ।

## বিবেকানন্দের সাহিত্য ও স্বদেশী আন্দোলন

স্বদেশী আন্দোলন শুরু হওয়ার কিছু পূর্বে (১২০২) বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন । দেশের দুঃখ দুর্দশায় যিনি তীব্রভাবে কাতর হয়ে পড়তেন সেই বিবেকানন্দ বঙ্গভঙ্গের সময় বেঁচে থাকলে হয়তো স্বদেশবাসীকে পথ নির্দেশ অথবা নেতৃত্ব দান করতেন । এই রূপ মন্তব্য অনেক বিপ্লবী ও দেশ নেতা করেছেন । ঊনবিংশ শতকে যে জাতীয়তাবাদ উদ্দীপ্ত হয়েছিল বিবেকানন্দের প্রভাব ছিল সেই ধারায় ক্ষেত্রে তীব্র । পরাধীন গ্রস্ত নির্জীব দেশবাসীকে দেখে মাঝে মাঝে তিনি হতাশ হয়ে পড়তেন ।

পরিব্রাজক জীবনে বহু মানুষের সংস্পর্শে তিনি আসেন । তাঁর মনের ভাবনা সম্পর্কে সিস্টার ক্রিস্টিনকে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলছেন , " বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করার জন্য আমি ভারতীয় নৃপতিদের নিয়ে একটি শক্তিজোট তৈরী করতে চেয়েছিলাম । সেই জন্যই আমি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি । সেইজন্যই আমি বন্দুক নির্মাতা স্যার হাইরাম ম্যাক্সিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম । কিন্তু দেশের কাছ থেকে আমি কোন সাড়া পাই নি , দেশটা মৃত । " ১

ভারতবর্ষ বিবেকানন্দের নিকট ছিল প্রাণের মোক্ষতীর্থ । তাঁর ভারত ছিল তাঁর সাধনার বস্তু । বিশ্বের দরবারে তাঁর ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার জন্য তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন । তিনি সমগ্র বিশ্বে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সারা বিশ্বে হিন্দু ধর্মের প্রভাব বিস্তারের আদর্শে দেশের মৃত প্রায় জনমনকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন । মানবেন্দ্র নাথ রায় বিবেকানন্দের এই ভাবনাকে ব্যক্ত করে বলছেন "His nationalism was spiritual imperialism. He called on young India to believe in the spiritual mission of India...on which subsequently built the orthodox nationalism of the de-classed young intellectuals, organised into search socities advocating violence and terrorism for the overthrow of British rule". ২

সমকালীন শিক্ষিত যুব সমাজ এই আধ্যাত্মিক বিজয়ে উদ্বেল হয়ে উঠে । বিবেকানন্দের বজ্র নির্ঘোষ বানী তাদের হৃদয়ে সাড়া জাগায় । ভারতবর্ষের সকল দুঃখের উৎসকে বিদেশী শাসকের ভারতের অবস্থিতি একমাত্র কারণ বলে তারা দেখেছিলেন । বিবেকানন্দের বানী শুনে তাদের মনে জেগে উঠে এক তীব্র

স্বাজাত্যাভিমান । ভারতের নৈরাজ্যবাদ ও সমাজের ক্ষয় তাঁর রূপে তাঁরা ব্যথিত ছিলেন । এই জন্যই তাঁরা পরবর্তী আন্দোলনগুলিতে ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে বিবেকানন্দের বানীতে গতি খুঁজে পেয়েছিলেন । বিবেকানন্দের এই আদর্শগত ভাব - ভূমি হতে বিপ্লবীরা প্রেরণা পেয়েছিল এবং এই ভাবভূমি হতে জন্ম নিয়েছিল বিপ্লব - বাদ ও বিপ্লবীদের কর্ম প্রচেষ্টা । স্বদেশী যুগেও এর ব্যতিক্রম হয় নি ।

বিবেকানন্দের তিরোধান ঘটেছিল ৪ঠা জুলাই , ১৯০২ । তার এক বৎসর পর হতেই বাংলার প্রান্তর উজ্জীবিত ও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে । বিবেকানন্দের বিশ্বজয়ী প্রভাব তখনও জনমানসে প্রদীপ্ত শিখার মতো প্রোজ্জ্বল ছিল । স্বাদেশিকতার নেতৃবৃন্দ ও যুব সম্প্রদায় তাঁর রচিত ' বর্তমান ভারত ' ও ' পত্রাবলী ' র মধ্যে প্রেরণার উৎস ধারা খুঁজে পেয়েছিলেন ।

স্বাধীনতা বা মুক্তির আকাংখা হল জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ বানী । বিবেকানন্দ এই মুক্তির উপাসক ছিলেন । বিবেকানন্দ কেবল মাত্র অতীন্দ্রিয় মোক্ষ বা মায়ার বন্ধন মোচনই চাননি , মানুষের বৈষয়িক মুক্তিও তিনি চেয়েছিলেন । বিবেকানন্দ বলতেন , " স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত । যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও কথা বলিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক তেমনি তাহার আহার,পোষাক , বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন – তবে এই স্বাধীনতা যেন অপর কাহারও অনিষ্ট না করে । " ৩ আবার অন্যত্র বলছেন সর্ব বিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ । যে সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্তির ব্যাঘাত করে , তাহা অকল্যাণকর যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয় তাহাই করা উচিত । যে সকল নিয়মের দ্বারা জীবন্ত স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয় , তাহার সহায়তা করা উচিৎ । " ৪

কিন্তু বিবেকানন্দজানতেন পরাধীন জাতির পক্ষে দৈহিক মানসিক আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব নয় । তাই ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষকে

বলেছিলেন 'India should be freed politically first.'
হৃদয়ে ছিল তাঁর পরাধীন মাতৃভূমির জন্য এক অন্তর্নিহিত বেদনা বোধ । তাই ভারতবর্ষ ছিল তাঁর "Queen of adoration, India was his day dream, India was his nightmare". ৬ ভারতছিল তাঁর একান্ত সাধনা দেবী। নিবেদিতা স্বামীজী সম্পর্কে বলেছেন " জন্ম প্রেমিক তিনি – তাঁর প্রেম পাত্রী তাঁর মাতৃভূমি । "

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারত অনুভূতিতে যে দ্বন্দ্বিক বিবর্তনবাদ চলেছে স্বামীজী তাকে লক্ষ্য করে চলেছিলেন । তিনি ' বর্তমান ভারত ' এ বলছেন , " এক দিকে জড়বিজ্ঞান , প্রচুর ধনধান্য , প্রভূত বল সঞ্চয় , তীব্র ইন্দ্রিয় সুখ , বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে , অপর দিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া ক্ষীণ অথচ মর্মভেদী স্বরে পূর্বদেবদিগের আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে । সম্মুখে বিচিত্রযান , বিচিত্র পান , সুসজ্জিত ভোজন , বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল , নূতন ভাব , নূতন ভঙ্গী অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে , আবার মধ্যে মধ্যে সেই দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত উপবাস , সীতা সাবিত্রী , তপোবন জটা বল্কল , কাষায় কৌপীন , সমাধি আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে । এ দিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনা অপর দিকে আর্য্য সমাজের কঠোর আত্মবলিদান । এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে – তাহাতে বিচিত্রতা কি ? পাশ্চাত্য উদ্দেশ্য – ব্যক্তিগত স্বাধীনতা , ভাষা – অর্থকরী বিদ্যা , উপায় রাষ্ট্র নীতি । ভারতের উদ্দেশ্য – মুক্তি , ভাষা – বেদ , উপায় ত্যাগ । বর্তমান ভারত এ বার যেন বুঝিতেছে , বৃথা ভবিষ্যত অধ্যাত্ম কল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্বনাশ করিতেছি , আবার মন্ত্র মুগ্ধবৎ শুনিতেছে : " ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষ । কথমিহ মানব তব সন্তোষ । " ৭

' বর্তমান ভারত ' ' উদ্বোধন ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । পরে এটি গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয় ১৩১২ সালে , ইংরাজীর ১৯০৫ এ । তখন বাংলায় প্রান্তরে স্বাদেশিকতার ঢেউ । দুর্বার বাংলায় কাছে ' বর্তমান ভারত ' প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায় ।

' বর্তমান ভারত ' এ বিবেকানন্দ দেশবাসীকে শোনালেন পাশ্চাত্য মোহ বিসর্জন করে স্বাদেশিক ভাবাপন্ন হতে । মনের দিক হতে যে পরানুকরণে বিশ্বাসী , পর শিক্ষায় লোভী সে জাতি স্বাধীনতা লাভ করতে পারে না । বিবেকানন্দ বলছেন – " বলবানের দিকে সকলে যায় , গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গায়ে কোন প্রকারে একটুও লাগে – দুর্বল মাত্রেরই এই ইচ্ছা । যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীয় বেশভূষামন্ডিত দেখি , তখন মনে হয় , বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত । চতুর্দশ বর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্সী এখনে আর ' নেটিভ ' নহেন । জাতিহীন ব্রাহ্মণসন্তানের ব্রাহ্মণ্য গৌরবের নিকটে মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণের বংশ মর্যাদা বিলীন হইয়া যায় । আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিখা দিয়াছে যে ঐ যে কটিতট মাত্র আচ্ছাদন কারী অজ্ঞ মূর্খ , নীচ জাতি , উহারা অনার্য্য জাতি । উহারা আমাদের নহে ।" ৮

বিবেকানন্দ পরানুকরণ বাদী ভারতবর্ষের মানুষকে সিংহ গর্জনে শোনালেন স্বদেশ মন্ত্র ।

" হে ভারত , এই পরানুবাদ , পরানুকরণ , পরমুখাপেক্ষা এই দাস সুলভ দুর্বলতা , এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা – এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে ? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীর ভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে ? হে ভারত , ভুলিও না – তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা , সাবিত্রী , দময়ন্তী , ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর , ভুলিও না তোমার বিবাহ , তোমার ধন , তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের জন্য , নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে , ভুলিও না – তুমি জন্ম হইতেই ' মায়ের ' জন্য বলিপ্রদত্ত , ভুলিও না – তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র , ভুলিও না নীচ জাতি , মূর্খ দরিদ্র , অজ্ঞ , মুচি , মেথর তোমার রক্ত তোমার ভাই । হে বীর সাহস অবলম্বন কর , সদর্পে বল আমি ভারতবাসী , ভারতবাসী আমার ভাই । বল

মূর্খ ভারতবাসী , দরিদ্র ভারতবাসী , ব্রাহ্মণ ভারতবাসী চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই , ভারতবাসী আমার প্রাণ , ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর , ভারতের সমাজ আমার শিশু শয্যা , আমার যৌবনের উপবন , আমার বার্ধক্যের বারানসী , বল ভাই – ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ , ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ , আর বল দিন রাত , '' হে গৌরীনাথ , হে জগদম্বে , আমায় মনুষ্যত্ব দাও , মা আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর , আমায় মানুষ কর । ''

১৯০৩ এ ( ১লা মাঘ , ১৩১২ ) প্রকাশিত হলো বিবেকানন্দের ' পরিব্রাজক ' । স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ এ আরেক তীব্র তরঙ্গের আবির্ভাব । সারদানন্দ ' পরিচয় ' মুখবন্ধে দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন , '' তাঁহার ( বিবেকানন্দের ) শ্রীমুখ হইতে যে সকল কথা শুনিলে , তাঁহার ভ্রমণ উদ্দেশ্য বিহীন নহে । কিসে ভারতেবর্তমান অমানিশার অবসান হইয়া পূর্বগৌরব পুনরায় উজ্জ্বলতর বর্ণে উদ্ভাসিত হইবে – এই চিন্তা ও চেষ্টাই তাঁহার প্রতি পাদ বিক্ষেপের মূলে । আবার ভারতবর্ষের দুর্দশা কোথা হইতে আসিল , কোন শক্তি বলে উহা অপগত হইবে , কোথায় বা সেই সুপ্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে এবং উহার উদ্বোধন ও প্রয়োগের উপকরণই বা কি – এ সকল গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিয়াই যে তাহাকে ক্ষান্ত দেখিবে তাহা নহে , কিন্তু বদ্ধ পরিকর জাতি স্বদেশে - বিদেশে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মীমাংসিত বিষয় সকলের সত্যতাও যথা সম্ভব প্রমাণিত করিয়াছেন তাহার নিদর্শনও প্রাপ্ত হইবে । বুদ্ধিমান বিদেশী তাঁহার উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিয়া বলপুষ্ট হইতে চলিল , হে স্বদেশী , তুমিও কি এইবার তোমারই জন্য বহু - শ্রমে সমাহৃত সারগর্ভ সত্যগুলি হৃদয়ে ধারণ এবং কার্য্যে পরিণত করিয়া সফল কাম হইবে ? '' ১

কুসংস্কার জড়িত ভারতবর্ষে উচ্চবর্ণের অকারণ অহমিকা ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থাকে ক্ষণভঙ্গুর করে তুলেছিল । পরিব্রাজকে বিবেকানন্দ এদের প্রতি তীব্র

কষাঘাত করলেন । " তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্ন পেটিকা রয়েছে । এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই । এখন ইংরেজ রাজ্যে – অবাধ বিদ্যা চর্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও যত শীঘ্র পার দাও । তোমরা শূন্যে বিলীন হও আর নূতন ভারত বেরুক । বেরুক লাঙল ধরে , চাষার কুটির ভেদ করে জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে । বেরুক মুদির দোকান হতে ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে । বেরুক কারখানা থেকে , হাট থেকে , বাজার থেকে । বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে । এরা সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে , নীরবে সয়েছে – তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা । সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে – তাতে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি । এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে , আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না , এরা রক্তবীজের প্রাণ সম্পন্ন । আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল যা ত্রৈলোক্যে নাই । এত শান্তি , এত প্রীতি , এত ভালবাসা , এত মুখটি চুপ করে দিন রাত খাটা এবং কার্য্য কালে সিংহের বিক্রম । অতীতের কঙ্কাল চয় । এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যত ভারত । " ১০

'পরিব্রাজকের' বিবেকানন্দ 'সন্ন্যাসী একা যাত্রী' রূপে ভারতের মুক্তির উৎস খুঁজতেই তিনি ১৮৯৩ এ আমেরিকা গেলেন এবং সেখানে বিশ্বজয়ীর সম্মান লাভ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দুর্বার করে তুলল । ভারতবাসী নিজেদের মধ্যে ফিরে পেল আত্ম প্রত্যয় । হীনমন্যতা দূর করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করল বীর্যবত্তার আসনে । বিদেশীর চোখে অসভ্যদের দেশ ভারতবর্ষ বিশ্বে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত হলো । বহু বৎসরের প্রচেষ্টা যা রাজনৈতিক নেতা বা অন্য কোন গুরুবাদে বিশ্বাসী সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্ভব হয় নি বিবেকানন্দের প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হলো । ১৮৯৪ সালে ১লা সেপ্টেম্বর 'অমৃত বাজার পত্রিকা' মন্তব্য করল,

"He has done much more to elevate our nation in ~~the~~ the estimation of the people of the West than what has hitherto been done by all our political leaders together."

সত্যই বিবেকানন্দ নিজেকে নিক্ষেপ করলেন ভারতের কাজে। জাগরণ চাই। তিনি জাতিকে শোনালেন অমোঘ মন্ত্র " আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারত মাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন, তোমার স্বজাতি এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত।" সত্য দ্রষ্টা ঋষির বাক্য মিথ্যা হয় নি। এই উক্তি করেছিলেন ১৮৯৭ এ। ১৯৪৭ এ ভারত স্বাধীন হয়ে যায়।

বিবেকানন্দের 'পত্রাবলী' প্রকাশিত হতেই ভারতবর্ষ বিবেকানন্দর সত্তাকে খুঁজে পায়। জীবনের প্রতিদিনের প্রতিটি মুহূর্তের অভিব্যক্তি এই 'পত্রাবলীতে' লিখিত। কি বিষময় জীবন জ্বালা দহনে তাঁকে চলতে হয়েছে। কোন সময়ে কত সমস্যায় পড়েছেন কিন্তু পত্র দিয়ে সারা জগৎকে সজাগ রেখেছেন। ভারতের মানুষকে পত্রের মধ্য দিয়ে চাবুক করেছেন। কখনও পথ নির্দেশ দিয়েছেন। এক একটি পত্র কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হলেও এই পত্রগুলো সার্বজনীন রূপ ধারণ করে বিবেকানন্দের মনোভাবনাকে প্রকাশ করেছে। পরম উৎসাহ ও চলার পথে অমৃত ময় আলোর প্রেরণাকারী এই পত্রাবলী জাতীয় আন্দোলন তথা বিপ্লবী আন্দোলনের অনুগামীদের আদর্শের পথের খোরাক ছিল।

আলস্য জর্জরিত ভারতের বুকে কর্ম প্রবাহ আনতে চেয়েছিলেন স্বামীজী। আলাসিঙ্গাকে লিখিত পত্রে তিনি বলছেন " ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো – মানুষ চাই, পশু নয়। প্রভু তোমাদের এই বাঁধাধরা সভ্যতা ভাঙবার জন্য ইংরেজ গভর্নমেন্টকে প্রেরণ করেছেন আর মাদ্রাজের লোকই ইংরেজদের ভারতে বসবার প্রধান সহায় হয়। এখন জিজ্ঞাসা করি, সমাজের এই নূতন অবস্থা আনবার জন্য সর্বান্ত করণে প্রাণপণ যত্ন করবে, মাদ্রাজ এমন কতক-গুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে কি প্রস্তুত, যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হবে, তাদের দুঃখার্ত মুখে অন্ন দান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার

করবে আর তোমাদের পূর্ব পুরুষদের অত্যাচারে যারা পশু পদবী উপনীত হয়েছে তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে ?" ১২

আরেক পত্রে স্বামীজী লিখছেন " সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে ধর্মকে বিনষ্ট করিয়া নহে , পরন্তু হিন্দু ধর্মের মহান উপদেশ সমূহ অনুসরণ করিয়া এবং তাহার সহিত হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি স্বরূপ বৌদ্ধধর্মের অদ্ভুত হৃদয় বত্তা লইয়া । লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস রূপ বর্মে সজ্জিত হইয়া দরিদ্র পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতি জনিত সিংহ বিক্রমে বুক বাধুক এবং মুক্তি , সেবা , সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা দ্বারে দ্বারে বহন করিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমন করুক । " ..... তিনি ঐ পত্রেই লিখেছেন " যাও , এই মুহূর্তে সেই পার্থ সারথির মন্দিরে – যিনি গোকুলের দীন দরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন , যিনি তাঁহার বুদ্ধ অবতারে রাজ পুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন , যাও , তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও , এবং তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর , বলি – জীবন বলি , তাহাদের জন্য , যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন , যাহাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন , সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য । তোমরা সারা জীবন এই ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর , যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে । এ এক দিনের কাজ নয় । পথ ভীষণ কন্টক পূর্ণ । কিন্তু পার্থ সারথি আমাদের সারথি হইতেও প্রস্তুত , তাহা আমরা জানি । তাঁহার নামে , তাঁহার প্রতি অনন্ত বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের শত শত যুগ সঞ্চিত পর্বত প্রমাণ অনন্ত দুঃখ রাশিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দাও । উহা ভস্মসাৎ হইবেই হইবে । " ১৩

আমেরিকায় ধর্ম বিজয়ী বিশ্ব শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী শতবিধ প্রশংসার জালে আবদ্ধ হোন নি । ভারতের দুঃখ দুর্দশায় তিনি ছিলেন ব্যথিত চিত্ত । বিশ্বজয়ীর রাজ

মুকুট মাথায় পড়েও তিনি পত্রে লিখছেন " ইহা দূর হইতে পারে যদি , কেবল যদি লোকের হারানো সামাজিক স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ফিরাইয়া আনা যায় । এখানে যে কেহ জন্মায় সেই জানে – সে একজন মানুষ । ভারতে যে কেহ জন্মায় সেই জানে – সে একজন ক্রীতদাস মাত্র । স্বাধীনতাই উন্নতির একমাত্র সহায়ক । স্বাধীনতা হরণ করিয়া লও তাহার ফল অবনতি । ..... ভগবান বড় বড় কাজ করিবার জন্য আমাদিগকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন , আর আমরা তাহা করিব । নিজেকে প্রস্তুত করিয়া রাখো , অর্থাৎ পবিত্র বিশুদ্ধ স্বভাব , এবং নিঃস্বার্থ প্রেম সম্পন্ন হও । দরিদ্র , দুঃখী পদদলিতকে ভালবাসো , ভগবান তোমাদের আশীর্বাদ করিবেন । " ১৪

বিবেকানন্দ মুক্তি খুঁজেছিলেন মানুষের কল্যাণবোধের মধ্যেই । ঈশ্বর সৃষ্ট মানুষের প্রতি তাঁর তীব্র অনুভূতি ছিল । ধর্ম বিজয়ের পর সেই দেশেও সন্ন্যাসী নিজের কর্তব্য স্থির করে রেখেছিলেন । একপত্রে তিনি লিখছেন " আমি এই যুবক দলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি । আর শুধু ইহারাই নহে , ভারতের নগরে নগরে আরও শত শত যুবক আমার সহিত যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে । ইহারা দুর্দমনীয় তরঙ্গাকারে ভারত ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে – এবং যাহারা সর্বাপেক্ষা দীন হীন ও পদদলিত – তাহাদের দ্বারে দ্বারে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য , নীতি ধর্ম ও শিক্ষা বহন করিয়া লইয়া যাইবে – ইহাই আমার আকাঙ্খা ও ব্রত , ইহা আমি সাধন করিব এবং মৃত্যুকে বরণ করিব । আমাদের দেশের লোকের না আছে ভাব , না আছে সমাদর করিবার ক্ষমতা । পরন্তু সহস্র বৎসরের পরাধীনতার ফলে উৎকট পরশ্রী কাতরতা ও সন্দিগ্ধ প্রবৃত্তির বশে ইহারা যে কোন নূতন ভাবধারারই বিরোধী হইয়া উঠে । " ১৫

স্বামীজীর চেতনার বাণী দেশ গ্রহণ করেছিল । স্বামীজী নিজেই অনুভব করলেন " আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন । কোন বহিঃশক্তিই ইহাকে এখন আর ইহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না । " ১৬

স্বামীজীর মৃত্যুর পর দেশবাসী প্রত্যক্ষ করল লক্ষ লক্ষ যুবক বিবেকানন্দের এই ভাব ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে জাতীয়তা জাগরণের যূপকাষ্ঠে প্রাণ বলিদানের জন্য এগিয়ে এল। তাঁর দেহত্যাগের পরই ভারত দেখল স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লব পন্থার অভ্যুদয়। স্বাধীনতাসংঘর্ষে জীবন বলিদান করতে হলে লৌহ ইস্পাত সদৃশ দেহ চাই, চাই বজ্র বলিষ্ঠ মন। স্বামীজী বলছেন, সংগ্রামের পথ পিচ্ছিল — দুঃখ মৃত্যু এর নিত্যসঙ্গী।

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন ভয় কি তোমার সাজে ?
দুঃখ ভার, এ ঈশ্বর, মন্দির তাহার শ্মশানভূমি চিতামাঝে।
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাব শ্যামা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধমান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।।

বিপ্লববাদের অনুষ্ঠানে যারা অংশীদার তাদের জীবনে সাধনার বস্তু হলো অগ্নি মন্ত্র। তাই "Swami Vivekananda appeared to be more a political prophet than a religions leader. ১৭ বিবেকানন্দ দ্বিতীয় বার পশ্চিমী দেশ ভ্রমণ করার পর বেলুড়ে বলেছিলেন "Bomb is what India needs to day". ১৮ ১৯০২ এ দেহ ত্যাগের পর তার এই উক্তি সত্যতে পরিণত হয়েছিল। বিপ্লবী জীবনের উপর তাঁর প্রভাব ছিল তীব্র। প্রখ্যাত বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বলছেন "Directly or indirectly the influence of Swamiji was great". As we could got get revolutionary literatuse within our reach, we read the letters of Swamiji. The Dialogue between Master and Disciple by Sarat Chandra Chakraborty and Vivekananda's lectures contained in 'From Colombo to Almora'. These books used to kindle fire in our hoasts. The debt do that patriot saint is irrideemable". ১৯

একবার স্বামীজী সখারাম গণেশ দেউস্করকে বলেছিলেন "The country has become a powder magazine. A little spark may ignite it. I will see the revolution in my life time". ২০

স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে বৃটিশ সরকার সজাগ ছিলেন। বিপ্লবীদের আস্তানায় বিবেকানন্দ সাহিত্য পাওয়া যেত। Political Troubles in India 1907-17- Edited by games Cambell Cass." এই গ্রন্থে বিভিন্ন গোপন রিপোর্টে জানা গিয়েছে বিপ্লবী আন্দোলনের উপর স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে।

স্বামীজী সম্পর্কে ইংরেজ সরকার প্রথম থেকেই সন্দিগ্ধ ছিলেন। ১৮৯৯ সালের ৩০শে অক্টোবর স্বামীজী মেরী হেলকে এক চিঠি লেখেন। তাতে তাঁর ইংরাজ শাসনের সম্পর্কে মনোভাব প্রকাশিত। " ..... আর আমরা আরম্ভ করেছি নতুন ভারত – ভিতর থেকে নিজের শক্তিতে উত্থিত ভারত – আমরা অপেক্ষা করে আছি কী ঘটে তাই দেখতে। কোনো নতুন মতবাদে আমরা তখনই বিশ্বাস করি যখন জাতি তাকে চায় এবং জাতির পক্ষে তা সত্য বস্তু হয়। ব্রাহ্ম সমাজ প্রভৃতির কাছে সত্যের পরীক্ষা হল – প্রভুরা তার অনুমোদন করেন কি না আর আমাদের কাছে ভারতীয় বিচার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুমোদিত করেন কি না আর আমাদের কাছে – ভারতীয় বিচার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা তা অনুমোদিত কি না – এর দ্বারা। লড়াই আরম্ভ হয়ে গেছে – ব্রাহ্ম সমাজও তোমাদের মধ্যে নয়, কারণ ইতিমধ্যেই ওরা শেষ হয়ে গেছে – এ লড়াই কঠিনতর, গভীরতর, আর অতি ভয়ানক।" ২১

শঙ্করী প্রসাদ বসু আরেক স্থানে এক তথ্য সন্নিবেশ করেছেন " নিজেন রেঁম আমাকে ( ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত ) বলেছেন স্বামীজী মিস ম্যাকলাউডের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনবার মতলব করেছিলেন — একথা

ম্যাকলাউড স্বয়ং তাঁকে বলেছিলেন । ম্যাকলাউড নিবেদিতার প্রচুর চিঠি নিজেল রেখে দিয়েছিলেন কিন্তু অনেক চিঠি বা চিঠির অংশ রেখের সামনে বসেই তিনি ছিঁড়েছিলেন, Too political বা Too personal বলে । " ২২

আমেরিকায় স্বামীজী ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁর ভাষণে সুস্পষ্ট মনোভাব জ্ঞাপন করেছেন । তাঁর এই বিবরণ পাওয়া যায় লুইবার্গ, মিসেস রাইটের লেখায়, " মানুষ যদি ঈশ্বরের প্রতিহিংসায় বিশ্বাস না করে, ইতিহাসের প্রতিশোধকে অগ্রাহ্য করতে পারবে না । ইংরেজের উপরে সেই প্রতিশোধ নামবে । তারা আমাদের গলায় পা দিয়ে রেখেছে, নিজেদের সুখের প্রয়োজনে আমাদের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত চুষে খেয়েছে, লুঠে নিয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ টাকা ..... আর আমাদের জনগণ সারা দেশ জুড়ে পেটে হাত দিয়ে পড়ে আছে । " ২৩

এই সব উক্তির জন্য ' তাঁকে ছদ্মবেশী কংগ্রেসওয়ালা বলে প্রচারের চেষ্টা হয় ', দেশে ফেরার পর স্বামীজীর উপর রাজনৈতিক অভিসন্ধি আরোপ করে তাঁর পেছনে গোয়েন্দা লাগানো হয় । ২৪ স্বামীজী নিজেও জানতেন যে তাঁকে ইংরেজ সরকার নজরে রেখেছে । ১৯০১ সালে ম্যাকলাউড কে ঐ চিঠিতে তিনি লিখছেন, " মিসেস লেগেটের শেষ যে চিঠিখানি এসেছে, তার খামটাকে নির্লজ্জভাবে ছিঁড়েছে । ভারতের ডাক বিভাগ আমার চিঠিগুলো একটু ভদ্রভাবে খুলবার চেষ্টা করে না ।" ২৫

ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে আন্দোলনের প্রতিভূ হিসাবে স্বামীজীকেই সন্দেহ করতেন । " স্বামীজীর মৃত্যুর পরও তাঁর সম্পর্কে, তাঁর লেখা সম্পর্কে, তাঁর প্রতিটি সংস্থা সম্পর্কে রাজশক্তির বিরূপতা কমেনি, বরং দেশ যতই মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয় হয়ে উঠেছে ততই তা বেড়েছে । ব্রিটিশ সরকার বুঝেছিল, এদেশে মুক্তি আন্দোলনে বিপুল প্রেরণা যোগাচ্ছে স্বামীজীর জীবনী ও বাণী । ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে বিস্ফোরণ – তার বারুদ স্বামীজীই । একজন পদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষ

একথা লিখেছেন। তিনি আটক বিপ্লবীদের কাছ থেকে জেনেছিলেন, যে এই সব মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা দিয়েছেন।" ২৬

Earl of Ronaldshay" লিখছেন "Suspecting nothing, I began to have closer intimacy with him and to have religious discourses with him at times. Gradualy he began to insert ideas of anarchism into my religiously disposed-mind, saying that religion and politics are inseparable and that our Paramount duty to should do good to the people of the country". The writer then tells how, he was given another book to read entitled 'Patravali', by Vivekananda and how he learnt from it what self sacrifice the author had made for the good of the country". ২৭

স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি তরুণদের আকৃষ্ট করার বিষয় ছিল বিবেকানন্দ। স্বামীজীর এই প্রভাবের কথা Sadition Committee তার রিপোর্টে লিখছে "Vivekananda died in 1902, but his writings and teachings survived him, have been propularised by the Ramkrishna Mission and have deeply impressed many educated Hindus. From much evidence before us it is apparent that this influence was perverted by Barindra and his followers in order to create an atmosphere suitable for the executions of their projects". ২৮

স্বদেশী ও বিপ্লবী যুগে স্বামীজীর লেখার প্রভাব দারুণ ভাবে বৃদ্ধি পায়। ইংরেজ সরকার বিভিন্ন গোপন জেরায় হামলা করে বিবেকানন্দের সাহিত্য আটক করত। এমন এক সময় এসেছিল ইংরেজ গোয়েন্দারা বিবেকানন্দের পত্রাবলী বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তাব করে।

"In the middle of 1915 Government of Bengal proposed to take action against the printer and publisher of 'Patrabali' Part I, 4th Edition of Swami Vivekananda for contraveling Sec. 4(c) of Press Act, 1910. Accordingly a copy of English translation of the allgd objectionable passages of the book was sent to Sri S.R.Das, standing council for legal opinion. Sri Das after going through the whole book, gave a seven pages opinion in which he said.

I am strongly of opinion after going through the whole book that is does not contravene Sec. 4(C.O. of the Act, of 1910).

On receipt of the said opinion and on the ground that the author of the book is dead, the Government dropped the matter".

স্বামীজীর প্রবন্ধ ' উদ্বোধন ' এ প্রকাশিত হলে তাও ইংরেজ সরকারের কোপ দৃষ্টিতে পড়ে ।

"During his life time Swamiji published a fortnightly journal from Belur Head Quarter of Ramkrishna Mission called 'Udbodhan'. In one of its issues, which was subsequently considered highly objectionable as it appeared from a report D/December 1907, Swamiji write 'You have all been hyptonised, your ruler tell you that you are low, subjucated and weak and what you believe to be true. I am made of earth of this country but I have not learnt to think myself like that, so those people who used do look down upon us, by God's will respecting me like God. Peping can not lead man into salvation. What is wanted is a keen aged sword and a war to death". ৩০

বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোধা কালীচরণ ঘোষ বলছেন , ' স্বামীজীর ভাববার কথা ' ইংরেজদের কোপ দৃষ্টিতে পড়ে । পুলিশ ঐ বই বহু জায়গা হতে বাজেয়াপ্ত করে । কালীচরণ ঘোষ লিখছেন " এই নিষিদ্ধ পুস্তিকা সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন । সকল ক্ষেত্রেই গ্রন্থকার , প্রকাশক প্রেসের মালিকদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা করা হয়েছে তা নয় , কেবল মাত্র সরকারী গেজেটে ছাপিয়ে এদের প্রচার বন্ধ করা হয়েছে , তারপর পুলিশ দেখতে পেলেই বাজেয়াপ্ত করেছে , মালিক ধরে টানাটানি করেছে , আর যাদের উপর রাজনৈতিক কারণে সরকার সন্দেহ পোষণ করতো বা কোনও ঘটনা সম্পর্কে থানা তল্লাসী করতে যেত সেখানে এই সকল সাহিত্য সন্দেহ ভাজন ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা গাঢ়তর করেছে এবং তদনুপাতে তাদের অপরাধের গুরুত্ব সপ্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে । কোন একটা ছেলে পাড়ায় ' স্বদেশী ' করে সুতরাং হয়তো গুপ্তচরের

পরামর্শে পুলিশ তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। খাতায় নামও উঠে গেল। তারপর পুলিশ তার বাড়ী তল্লাসী করলো, অন্যকিছু অর্থাৎ বোমা, বন্দুক রিভলভার, তরোয়াল, রামদাও, ছোরা, গুপ্তি, সড়কী — এমনকি এক গাছি লাঠিও না পেলেও যদি গীতা, আনন্দমঠ, স্বামীজীর 'ভাববার কথা', গিরিশ চন্দ্রের 'সিরাজদৌল্লা', দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ' প্রভৃতি কিছু পেয়ে থাকে তাহলে অন্ততঃপক্ষে থানায় টেনে নিয়ে হয়তো দুচারটে গোঁত্তা রুদ্দা, ঘুঁষি, চড় দিয়ে এবং কুটুম্ব সম্পর্কিত মিষ্ট বচন আউড়ে থানায় গারদে আটক করে রেখেছে, 'সদর' থেকে 'টিকটিকি' পুলিশ এসে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যানুসন্ধান এবং প্রশ্নবানে জর্জরিত করে তারপর হয়তো বা ছেড়ে দিয়েছে, আর নয়তো বিনা বিচারে বন্দী করে জীবনের বহু অমূল্য সময় নষ্ট করে দিয়েছে।" ৩১

ইংরেজ পুলিশ রামকৃষ্ণ মিশনকেও সন্দেহ করত বিপ্লবী আন্দোলনের যোগ-সূত্র হিসেবে। "There are indications that the Mission and its followers were connected with the revolutionary upheaval in India which has convulsed the student community in Bengal and extended its influence in and Native States". ৩২

স্বামীজীর মৃত্যুর পর স্বামী ব্রহ্মানন্দ সভাপতি হলেন। তাঁর সম্পর্কেও ইংরেজদের সন্দেহ ছিল "After the death of Swamiji in 1902 Swami Brahmananda became the president and head of the Ramkrishna Mission all over India and outside.

These Mission aries are suspected of preaching Swaraj and Brahamananda alias Rakhal Ghose has been described as leader of these men".

বিমান বিহারী মজুমদার বলছেন "যুগান্তর গোষ্ঠীর কর্ম পরিষদের সদস্য হরিকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন যে স্বামীজীর অনুপ্রেরণা পূর্ণ শিখা ছাড়া বিপ্লব আন্দোলন যে রূপ নিয়েছে, তা নিতে পারত কিনা সন্দেহের ব্যাপার।" ৩৪

তিনি আরও বলছেন Romains Rolland rightly holds that Vivekananda's non Vedantaism spread like burning alcohol in the veins of the intoxicated nation". ৩৫

## বিপিন চন্দ্র পাল (১৮৫৮ - ১৯৩২)

বিশ শতকের গোড়ায় বাংলার প্রান্তরে যে প্রবল প্রবাহ দেখা গেল যা গঙ্গার তীব্র স্রোতকে মথিত করে পদ্মা মেঘনা বুড়িগঙ্গাকে হিল্লোলিত করেছিল এবং যার ঢেউ এর তীব্রতায় দুর্মদ ইংরাজ শাসক গোষ্ঠী পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল সেই বিস্ফোরণ এর নাম বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন। ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম সুসংহত সঙ্ঘবদ্ধ আদর্শবাদী বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতার সংগ্রাম। আর এই স্বাধীনতা সংগ্রাম 'লাল - বাল - পাল' এর যে ঐক্যবদ্ধ রূপ যা ভারতের জনচিত্তে এক স্থায়ী আসন গ্রহণ করেছিল বিপিন চন্দ্র পাল ছিলেন সেই আন্দোলনের পটভূমিতে স্বকীয়বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

" সমকালীন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তাঁকে স্বদেশী যুগের স্বাধীনতার সাধকদের মধ্যে সর্বাগ্রগন্য বললে অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্র নাথের

উক্তি অনুসরণে বলা যায় , বিংশ শতাব্দীর উষা কালে ভারতে রাজনৈতিক আকাশে বিপিন চন্দ্র ছিলেন ' ভোরের পাখি ' । তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বরকে আশ্রয় করেই নব্য জাতীয়তাবাদ এবং যৌক্তিক স্বাদেশিকতার নব্য ভাবধারা ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রচার লাভ করেছিল । আর তাঁর সেই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর অনর্গল লেখনী । " ৩৬

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা বিপিন চন্দ্রকে বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থাপন করল । তিনি এই নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন । বিনয় কুমার সরকার বলছেন , " বিপিন চন্দ্র শুধু গলার জোরে বাংলা , মাদ্রাজ , বোম্বাই , পাঞ্জাবকে যুক্ত করেন নি , বিদ্যায় , রাষ্ট্রনীতি , জ্ঞানে , দার্শনিকতায় , বিপ্লবযুগে কর্তব্য নিষ্ঠায় বিপিন পালের ঠাঁই ছিল উঁচু ..... বঙ্গ বিপ্লবের জন্মদাতা নেতা । " ৩৭

বিপিন চন্দ্র পাল জাতীয় জীবনে স্মরণীয় নেতাদের সংস্পর্শে আসেন । ১৮৮৭ কংগ্রেসের মাদ্রাজের অধিবেশনে তাঁকে প্রথম দেখা যায় । তখনও তাঁর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য অটুট ছিল । তিনি বলছেন "I was a democrat, democrat of democrats, a radical of radicals, yet I said that neither my democracy nor my radicalism took away in the least measure from my loyalty to the British Government". ৩৮

তিনি ' নিউ ইন্ডিয়া ' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৯০১ সালে । এর আগেও ' ইন্দু প্রকাশ ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে । অরবিন্দের চরমপন্থী ও বিপ্লবী চিন্তার প্রকাশ ' ইন্দু প্রকাশ ' এ (১৮৯০ - ৯৪) দানা বেঁধেছে । এর মধ্যে ১৯০০ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব পেশ হলো । বিপিন চন্দ্রের ইংরাজ আনুগত্যে প্রচন্ড ধাক্কা খেল । নিউ ইন্ডিয়া ' সংস্কৃতির পথ পরিবর্তন করে ইংরেজ শাসন হতে মুক্তির

বজ্রগর্ভ বানী প্রকাশিত হতে লাগল , ভারতবর্ষ তখন উত্তাল । কংগ্রেসের অনুসৃত ' নরম পন্থা ' নীতিতে জাতি বিরক্ত । নবীন প্রজন্মের দল স্বাধিকারের বানীতে উদ্বুদ্ধ । বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদ ও তিলকের নেতৃত্বে মুক্তির আন্দোলনে যুব সমাজ অনুপ্রাণিত । দেশ তখনও স্বাধীনতার হাওয়া উঠেনি । বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম দিল । বিপিন চন্দ্র পাল বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনকে শুধু মাত্র অর্থনৈতিক দিক থেকে সাময়িক উপায় হিসেবেই দেখেন নি , মুক্তি সংগ্রামের অস্ত্র রূপে দেখতে চেয়েছিলেন । সেই সঙ্গে তিনি চাইলেন ইংরেজের গড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিহার করে দেশ তার জাতীয় চেতনার ভিত্তি মূলে স্বদেশী শিক্ষা ও শিক্ষালয়ের প্রবর্তন ।

বঙ্গভঙ্গ চলাকালীন সময়ে কার্জন থিয়েটারে বয়কটের পক্ষে জনসভা হচ্ছিল । হাজার হাজার লোকের সামনে বিপিন চন্দ্র বললেন , " যতদিন পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রদ না হয় , ততদিন কি আপনারা ব্রিটিশ পণ্য দ্রব্য বয়কট করে যেতে পারবেন ? " সমস্বরে শ্রোতৃবৃন্দ চীৎকার করে উত্তর দিলেন " বয়কট চিরকালের জন্য । " ৩২

স্বদেশী যুগে কার্লাইল সার্কুলার ' এর মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনকে স্তব্ধ করার প্রচেষ্টা চলছে । ২৪শে নভেম্বর ফিড য়্যান্ড য়্যাকাডেমি 'র মাঠে জনাব আবদুল উসুলের সভাপতিত্বে এক বিরাট ছাত্র সভায় ভাষণ দিবার সময় বিপিন চন্দ্র আহ্বান জানালেন , " তোমরা মায়ের নামে প্রতিজ্ঞা করেছ এবার পরীক্ষা দেবে না । আবার দ্বিধা করছ কেন ? সেদিন গোল দীঘিতে যখন নিজেরা বলেছিলে আমরা 'গোলাম খানা ছাড়ব ' তখন কার কথা শুনে বলেছিলে ? আজ যদি এই ' রাজার মাঠে ' দাঁড়িয়ে দৃঢ়ভাবে বল " আমরা এখানে দাঁড়ালাম , ওখানে আর যাব না , সেখানে To Let লেখা হয়েছিল , সেখানে আমরা যাব না , দৃঢ়ভাবে যদি এবথা বলতে পার , তবে স্বদেশী বিদ্যালয় হবেই হবে । অন্য পন্থা নাই । ..... পড়াশুনা ছেড়ে দল বেঁধে মুখে বল ' বন্দেমাতরম ' , আর প্রাণে মায়ের অভয় নিয়ে যাও — বরিশালে যাও , যাও মাদারিপুরে যাও , যাও ফরিদপুরে

যাও। যেখানে গুর্খা গিয়েছে সেখানে যাও, যেখানে ওর্খা যায় নি সেখানে যাও। গিয়ে গ্রামে গ্রামে 'বন্দেমাতরম' রব তুলে দাও।" ৪০

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রবক্তা ছিলেন বিপিন চন্দ্র। তিনিই এর প্রথম উদ্গাতা। "Our method is Passive Resistance, which means an organised determination to refuse to render any voluntary and honourary service to government." ৪১

আরেক স্থানে তিনি এই প্রসঙ্গে বলছেন "Passive Resistance is not non-active, but non agressive resistance, we stand upon our rights. We stand within the limits of law that we have still in the country." ৪২

বিপিন চন্দ্র স্বদেশী আন্দোলনকে শুধুমাত্র একটি কৌশল রূপে দেখেন নি। জাতীয় সংগ্রামকে ও জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এটিকে বলিষ্ঠ পদ-ক্ষেপ রূপে গণ্য করতেন। তিনি কলকাতা কংগ্রেসে (১৯০৬) মন্তব্য করছেন, "It is impossible to work out a divorce between politics and economics, politics and industrial advancement in India, Swadeshism associates itself with politics it becomes boycott, and this boycott is a movement of passive resistance. ৪৩

বিপিন চন্দ্র স্বরাজের স্বরূপকে সঠিক ভাবে নির্নয়ের চেষ্টা করেন। তিনি স্বরাজ বলতে জনগণের স্বরাজ বুঝতেন। তিনি এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করছেন "The ideal of Swaraj that has revealed itself to us is the ideal of Divine Democracy. It is the ideal of democracy higher than the fighting, the pushing, the materialistic, I was going to say, the equel democracies of Europe and America.

This is a higher message still. Men & Gods, and the equality of the Indian Democracy is the quality of the divine nature, the divine possibilities and the divine destiny of every individual being. " ৪৪

নব জাগ্রত জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য ছিল স্বদেশ প্রেম । ইংরেজি প্রতিশব্দ ছিল Patriotism. । বিপিন চন্দ্র স্বদেশ প্রেমের বা প্যাট্রিয়টিজম এর প্রবক্তা ছিলেন । কিন্তু সেই স্বদেশ বোধ ইউরোপীয় চিন্তা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের ছিল । ইউরোপের প্যাট্রিয়টিজম অন্যের অন্ন গ্রাস করে নিজের দেশ সমৃদ্ধ করার ভাবনা ছিল । কিন্তু ভারতবর্ষে এই ধারণা ছিল না । বিপিন চন্দ্র ইউরোপের Patriotismকে সংশোধন করে তার ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন । এই প্রেরণা বশে স্বদেশী আন্দোলনের উত্তপ্ত দিন গুলোতে তিনি ১৯০৬ , ১৬ই অক্টোবর ' বন্দেমাতরম ' পত্রিকায় জাতীয় দিবস পালনের জন্য দেশবাসীকে বলেন " আমরা এই দিনটিকে সেই স্বাদেশিকতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করি যা মানবতার মধ্যে চরিতার্থতা সন্ধান করি । আমরা এই দিনটিকে সেই মানবতার উদ্দেশ্যেও উৎসর্গ করি , যে মানবতা মানুষের কাছে ঈশ্বরের শাশ্বত প্রকাশের নামান্তর । "

এই বিপিন চন্দ্র পাল যখন কারাগৃহ হতে মুক্তি লাভ করে বেরিয়ে এলেন অরবিন্দ ঘোষ ' বন্দেমাতরম ' এ লেখেন " আমরা আজ বিপিন চন্দ্র পালকে নয় ঈশ্বর দত্ত বানীর প্রবক্তাকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানাচ্ছি , মানুষটিকে নয় , জাতীয়তাবাদের বানীর মূর্তিমান কণ্ঠকে । .... তাকে স্বাগতম , বারবার স্বাগতম । "

স্বদেশী যুগে বিপিন চন্দ্র যে ভাবে আন্দোলন পরিচালনা করেছেন ঠিক সেই ভাবে জনসাধারণের চিন্তাশক্তিকে প্রাণবন্ত করার জন্য তিনি সাহিত্য রচনায়

ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্য রচনার পরিধি সর্ব বিষয়ে যুক্ত ছিল। তদানীন্তন আন্দোলন ভাবনা ও আদর্শ নিয়ে অনেকপ্রবন্ধ রচনা করেন। এগুলো (১) রাজধর্ম (২) প্রশ্নোত্তর (৩) আমাদের ভলান্টিয়ার দল (৪) রাজাপ্রজা (৫) বঙ্গচ্ছেদ বঙ্গের অবস্থা (৬) বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের ব্যবস্থা (৭) জাপান ও হিন্দু আত্মীয় সাধনা (৮) মায়ার পথ ও মুক্তির পথ (৯) স্বদেশী বা পেট্রিয়টিজম (১০) নেশন বা জাতি (১১) শিবাজী উৎসব (১২) শিবাজী উৎসব ও ভবানী মূর্তি (১৩) আগামী কংগ্রেসের প্রধান সমস্যা (১৪) আবেদন - আন্দোলন (১৫) রাজভক্তি (১৬) কং গ্রেসের কথা (১৭) ইজ্জৎ (১৮) ডিপ্রেসড ক্লাসেস মিশন (১৯) স্বদেশী ও বয়কট (২০) রাখীবন্ধন (২১) পাশ্চাত্য গণতন্ত্রতা (২২) ভারতের ভবিষ্যৎ ও লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসন নীতি (২৩) আমাদের রাষ্ট্রীয়ত্ব মতবাদ (২৪) হিন্দু - মুসলমানের মিলন (২৫) হিন্দু মুসলিম আর্টাড, ইত্যাদি। এই প্রবন্ধ গুলির মধ্যে অনেকটি বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনের কালে লিখিত (১৯০৫-১৯১০)। বাকী গুলো ১৯১১ সালের পরের লেখা।

১৯০৫। ইংরাজ সরকার বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তে অটল। বাংলা জুড়ে এক অনিশ্চয়তা। এই পটভূমিকায় তাঁর রচনা 'রাজধর্ম' প্রকাশিত হলো 'ভান্ডার' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায়, সাল ১৩১২ ( ইং এপ্রিল-মে, ১৯০৫ )। বাংলার প্রজাশক্তি ইংরাজের বঙ্গবিভাগ সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ। প্রজার সাথে শাসকের সংঘর্ষ উপস্থিত। এই পরিস্থিতিতে তিনি 'রাজধর্ম' লিখলেন "প্রজাশক্তিহইতেই রাজশক্তির উৎপত্তি হয়। প্রজা যদি রাজ আধার হইতে আপনার বিপুল শক্তি রাশি প্রত্যাহার করে, রাজার পক্ষে মুহূর্ত কালের জন্যও শাসন দন্ড ধারণ করা অসাধ্য হয়ে উঠে। ..... প্রজাও আত্ম প্রয়োজনেই রাজার সৃষ্টি করে। আত্ম - রক্ষা ও আত্মোন্নতির সুব্যবস্থা করিবার জন্যই প্রকৃতি পুঞ্জ আপনাদিগের স্বাভাবিক স্বাধীনভাবে সঙ্কুচিত করিয়া রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা ও তাহার বশ্যতা স্বীকার করে।"

তাই বিপিন চন্দ্র পালের অভিব্যক্তি " রাজা আপনার সুখ ভোগ বা সুখ অন্বেষণে নহে , কিন্তু প্রজার কল্যাণ সাধনে রাজার সমুদয় শক্তিকে নিয়োজিত করিবে ইহাই সনাতন রাজধর্ম । প্রজার প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয়ে রাজশক্তি প্রযুক্ত হইলেই রাজধর্মের ভীষণ ব্যতিচার ঘটিয়া থাকে এবং এই ব্যতিচার নিবন্ধন ক্রমে প্রজাধর্মও বিলোপ প্রাপ্ত হয় এবং সমাজ মধ্যে অত্যাচার , অবিচার , উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিপ্লবাদি আনয়ন করিয়া থাকে । " তিনি রাজধর্মের স্বরূপের উদাহরণ দিয়ে বলছেন , " বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষ যেমন আপনার সমুদয় জীবনী শক্তিকে বীজ - রূপে পরিণত করিয়াই কৃতার্থ হয় , সেইরূপ বিপুল প্রজাশক্তি হইতে প্রচ্ছন্ন ভাবে উৎপন্ন রাজশক্তিও পরিস্ফুট ও পরিপক্ক আকারে পুনরায় সেই প্রজা মন্ডলীতেই প্রত্যাবর্তন করে । এইরূপে রাজশক্তি সাক্ষাৎ ভাবে প্রজাপুঞ্জে প্রত্যার্পিত হইলেই রাজধর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় । "

এই আন্দোলন সময়ে বিপিন চন্দ্র পালের ' রাজা ও প্রজা ' প্রবন্ধটি ' বঙ্গদর্শনে 'র আশ্বিন সংখ্যায় ( সেপ্টেম্বর - অকটোবর , ১২০৩ ) প্রকাশিত হয় । তদানীন্তন সময়ে ইংরেজ শাসনের উদার নৈতিক চরিত্র ও গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা সম্পর্কে লোকের মোহ ভাঙতে শুরু করেছে । লোকে অনুভব করছেন ইংরাজ শাসনের প্রকৃত চরিত্র ভেদবুদ্ধি ও স্বৈরাচারিতা । একে আশ্রয় করেই তাদের শাসন ব্যবস্থা । বিপিন চন্দ্র ' রাজা ও প্রজা 'য় এই ভাবনা সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন " আজও যদি আপনার স্বার্থ রক্ষার জন্য সে উদারতা আবশ্যক মনে করিত ইংরেজ প্রাণ পনে তাহা অবলম্বন করিয়া চলিত । কিন্তু আজ ইংরেজ ভারতে অভয় পদ পাইয়াছে । প্রজামন্ডলী দুর্বল , নিঃস্ব , নিরস্ত্র ও নির্বীর্য হইয়া পড়িয়াছে । ইংরেজের আধুনিক অত্যাচার - প্রবণতা ভারতের প্রকৃতি পুঞ্জের নিশ্চেষ্টতা ও বীর্যহীনতারই প্রতিফল । " অধীনস্থ প্রজার উপর অত্যাচার করা যেন সার্বজনীন । বিপিন চন্দ্র বলছেন , " ইংরেজ আজ যাহা করিতেছে , তাহার মূল মানব প্রকৃতির মধ্যে । ইংরেজ আমাদের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছে , তাহার স্থলাভিষিক্ত হইলে আমরাও আমাদের অধীনস্থ জনমন্ডলীর প্রতি ঠিক তাহাই করিতাম । " তিনি

উদাহরণের সাহায্যে বলছেন , " জাপানের মহত্ত্বে , জাপানের সংযমে ও আত্ম - ত্যাগে , জাপানের ধর্ম তীব্রতায় আজ জগৎ বিমুগ্ধ , বিস্মিত , নতশির হইয়া তাহাকে ধন্যবাদ করিতেছে । কিন্তু এই জাপান যদি দ্বিশতবর্ষাধিকালে ইংরেজের মত একটা বিরাটাকার নির্বীর্য জাতির উপরে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজনৈতিক অধিকার ও আধিপত্য ভোগ করিতে সমর্থ হয় , তবে তাহার এ সদগুন বেশীদিন কখনই টিকিয়া থাকিবে না । তাই ইংরেজকে যেমন বুঝিতে হইবে যে প্রজা শক্তি-র আনুকূল্য লাভ ব্যতীত ভারতের তাহার প্রভুত্ব হইতে পারিবে না , সেইরূপ ভারতের প্রজা সাধারণকেও ইহা বুঝিতেহইবে যে তাহাদের আত্মশক্তি জাগ্রত , সংহত ও যথাযোগ্য বিষয়ে প্রযুক্ত না হইলে এ দেশে ইংরেজ প্রভুশক্তি কদাপি জাতীয় জীবনের চরিতার্থতা সম্পাদনের সহায় হইতে পারিবে না । "

বঙ্গভঙ্গের পটভূমিতেই তার দুটি প্রবন্ধ ' বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা ' ( বঙ্গ দর্শন , কার্তিক , ১৩১২ , অক্টোবর - নভেম্বর ১৯০৫ ) ও ' বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের ব্যবস্থা ' ( বঙ্গ দর্শন , অগ্রহায়ণ , ১৩১২ , নভেম্বর - ডিসেম্বর , ১৯০৫ ) প্রকাশিত হলো । বিপিন চন্দ্র বঙ্গভঙ্গের উত্তাল তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন । তিনি একদিকে ছিলেন এই আন্দোলনের পথিকৃৎ অন্যদিকে এর স্থিতধী ভাষ্য - কার । তিনি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ' বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা ' প্রবন্ধে বলছেন , " বাঙ্গালা বিভাগের বিরুদ্ধে সচরাচর যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে , তাহা অধিকাংশ স্থলেই আমার নিকট অলীক ও অসার বলিয়া মনে হয় । সাক্ষাৎ - ভাবে এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা আমাদের মানসিক বা নৈতিক বা অর্থগত বা সমাজগত কোন বিশেষ অনিষ্ট পাতের আশংকা আছে , ইহা আমি মনে করি না । " তিনি প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে গতির দিক সম্পর্কে অবহিত করছেন , " আসল কথাটা এই যে ইহা দ্বারা ইংরেজ এমন এক স্থানে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যোগী হইয়াছে , যাহার উপরে আমাদের সকল ভবিষ্যৎ উন্নতি ও মুক্তি নির্ভর করিতেছে । এই প্রস্তাবের দ্বারা ইংরেজ রাজ আমাদের নবোন্মেষিত জাতীয় জীবনের

কেবল যে সেলব পল্লবে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে , তাহা নহে , কিন্তু তাহার মূলে একেবারে আপনার সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা চালাইবার চেষ্টা করিতেছে । " বিপিন চন্দ্র অভিমত প্রকাশ করে বলছেন , " বঙ্গ বিভাগ কেবল বাংলা নহে , কিন্তু সমগ্র ভারতের নবোদ্বোধিত জাতীয় জীবনের উপরে বিষম কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে । "

' বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা ' প্রবন্ধে তিনি বাংলা ভাগ করার পর যে বাস্তবিক অবস্থা ও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার বিবরণ দিয়েছেন । আর ' বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের ব্যবস্থা ' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি ব্যবস্থার পথ দেখিয়েছেন । বিপিন চন্দ্র মনে করেন বঙ্গের আয়তন বিশাল বলে বঙ্গভঙ্গ হয় নি , " ইহার মূলে গভীর , কুটিল রাজনীতি বিদ্যমান রহিয়াছে । রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইংরাজ এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে , সহজে কদাপি ইহা হইতে বিরত হইবে না । " তিনি মনে করেন এই বিচ্ছেদের কারণ হিন্দু মুসলমানে ঐক্য সৃষ্টি করা । প্রথমত যে সূত্রে হিন্দু মুসলমানে বিবাদ হইবার সম্ভাবনা তাহা নষ্ট করিয়া দিতে হইবে । ইহার একসূত্র সরকারী চাকুরি , অপর সরকারী অবৈতনিক সম্মানার্হ পদ ও খ্যাতি । এই দুই লোভ যদি জয় করিত তবে ইংরেজ শত চেষ্টা করিয়াও আমাদিগের মধ্যে কোন বিরোধ উৎপন্ন করিতে পারিবে না । " তিনি হিন্দু - মুসলমানের নিকটে আসা প্রসঙ্গে বলছেন , " হিন্দু দিগের মধ্যে মুসলমানের এবং মুসলমানের মধ্যে হিন্দু সাহিত্য ও সাধনার সম্যক প্রচার করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ভদ্র মণ্ডলীকে পরস্পরের শ্রদ্ধাবান করিতে হইবে । বিদেশীয় পণ্য ব্যবহার হইতে বিরত হইয়া বঙ্গ বিভাগ নিবারণের যে চেষ্টা হইয়াছে , তাহাকে সর্ব প্রযত্নে জাগাইয়া রাখিতে হইবে । "

' স্বদেশী বা পেট্রিয়টিজম ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ' বঙ্গ দর্শন ' এ চৈত্র , ১৩১২ সংখ্যায় । ' শ্রী: ' ছদ্ম নামে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল । পরের বৎসর ১৩১৩ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণের ' বঙ্গ দর্শনে ' বিপিন চন্দ্র পালের নামে ' নেশন

বা জাতি' শিরোনামায় পূর্ব প্রবন্ধের অনুবৃত্তি রূপে প্রকাশিত হয়। তিনি এই প্রবন্ধে বলছেন " যে ভাব ও আদর্শকে আমরা এখন স্বদেশী নামে নির্দেশ করিতেছি, তাহা এদেশে নিতান্তই নূতন। ..... ইংরাজীতে ইহাকে পেট্রিয়টিজম বলে। ... এ বস্তু পূর্বে আমাদের দেশে ছিল না, এমাদের ভাষায় ইহার নাম নাই।" তিনি বলছেন " য়ুরোপে গ্রীকেরা পেট্রিয়টিজেমের আদি গুরু ছিলেন। গ্রীক সমাজতন্ত্রের মধ্যে এই অপূর্ব স্বদেশচর্যের বীজ নিহিত ছিল।" বিপিন চন্দ্র বলছেন, " হিন্দু বৈশিষ্টকে উপেক্ষা ও চূর্ণ করিয়া নির্বিশেষ ভাবে তত্ত্ব বস্তুকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে। সকল জাগতিক সম্বন্ধকে অলীক বা মায়িক বলিয়া উড়াইয়া দিয়া হিন্দু জগদতীত ও মায়াতীত, নির্গুন নির্বিশেষ চৈতন্য বস্তুর অন্বেষণে গিয়াছে। গ্রীক সে পথে যায় নাই। হিন্দু মুখ্যত নির্গুনবাদী, গ্রীক মুখ্যত মন্ডণবাদী। গ্রীক জগতের সম্বন্ধ সমূহকে একান্ত অবলম্বন ও আশ্রয় করিয়া তাহার উপরে সমাজ ও রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছে। হিন্দু সম্বন্ধকে উপেক্ষা করে নাই, কিন্তু এই সকল সম্বন্ধের মধ্যে সকলে সম্বন্ধের আধার ও অবলম্বন রূপে তত্ত্ববস্তুকে পাইতে প্রয়াস পাইয়াছে। এখানেই গ্রীক ও হিন্দুর মধ্যে বিশাল প্রভেদ দাঁড়াইয়া যায়।" তাই বিপিন চন্দ্র পালের ভাষায় " ভারতের ধর্ম যেমন সনাতন, গ্রীসের স্টেট সেইরূপ সনাতন বস্তু। ভারতে ধর্মের শাসনে, ধর্মের চর্চা করিয়া জীবনের সফলতা লাভের চেষ্টা করিয়াছে। গ্রীসে স্টেটের শাসনে, স্টেটের চর্চা করিয়া আপনার সমুদয় শক্তিসামর্থের সার্থকতা সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছে। এই স্টেট রাজনীতির মূল। স্টেটের মধ্যে বিবিধ ব্যক্তির ব্যষ্টিভাবে ব্যক্তি সকলের পরস্পরের সঙ্গে ও সমষ্টিভাবে ঐ স্টেটের সঙ্গে যে সম্বন্ধ তাহাই রাজনীতির বিষয়। এই সকল সম্বন্ধের মধ্য দিয়া জীবনের সফলতা লাভ করিবার চেষ্টা হইতেই গ্রীসে পেট্রিয়টিজমের জন্ম হয়।"

বিপিন চন্দ্র পালের জীবনীকার শিবদাস চক্রবর্তী বলছেন যে এই প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়ার পর ইন্দ্রনাথ দেব শর্মা ও অজিত কুমার চক্রবর্তী ঐ প্রবন্ধের বক্তব্য সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ৪৩ টি প্রশ্নের উত্তরেই বিপিন চন্দ্রের 'নেশন বা জাতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি 'বঙ্গ দর্শনে'র পর পর দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তিনি 'নেশনে'র ব্যাখ্যা করে বলছেন, " নেশন হইতে গেলেই জগতের

অপরাপর মানব সমষ্টি হইতে পৃথক হইয়া দাঁড়াইতে হয়। এই পার্থক্য, এই পরিচ্ছন্নতা, এই স্বাতন্ত্র্য ব্যতীত জাতি বা নেশনের উৎপত্তি অসম্ভব। .... অপর নেশনের সঙ্গে ভেদ আর নিজের নেশনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যথা সম্ভব অভেদ ও একাত্মতার প্রতিষ্ঠা নেশন গঠনের মূলতন্ত্র।" রবীন্দ্র নাথের দেশ প্রেমের ধারণা হতে বিপিন চন্দ্রের ধারণার পার্থক্য ছিল। রবীন্দ্র নাথ বিশ্বপ্রেমের ভিত্তির উপর স্বদেশ প্রেমকে বসিয়ে ছিলেন। বিপিন চন্দ্র স্বদেশ প্রেমের ভিত্তির উপর বিশ্বপ্রেমকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি 'নেশন বা জাতি' শীর্ষক প্রবন্ধের দ্বিতীয় সংখ্যায় বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন "নেশন অভিমান হইতেই দেশচর্য বা পেট্রিয়টিজমের উৎপত্তি হয়। সকল মানুষই সমান – এক অর্থে ইহা অত্যন্ত সত্য – সত্যই জাতিগত, বর্ণগত, দেশগত, নেশনগত, প্রভৃতি যাবতীয় ভেদ জ্ঞান একেবারে বিলোপ প্রাপ্ত হয়। সে অনাবিল উদার বিশ্বপ্রেম সাধন না করিলে মানব জন্ম সার্থক হয় না, স্বীকার করি। কিন্তু প্রত্যক্ষ ভেদাভেদকে উপেক্ষা করিয়া এই অভেদ জ্ঞান লাভ হয় না। সত্য ও অভেদ জ্ঞান ভেদের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃত উদার ও বিশ্বজনীন মৈত্রী ও সেইরূপ ভেদ - প্রাণ স্বদেশ-চর্যোর মধ্য দিয়াই সাধিত হয়। অন্য উপায়ে নয়।"

স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ববর্তী সময়ে তিলক মহারাষ্ট্রে শিবাজী উৎসব শুরু করেছিলেন। পরাধীন জাতিকে সঞ্জীবনী মন্ত্রে উদ্বোধিত করার জন্য এই জাতীয় বীরের জীবন ছিল উদ্দীপনাময়। জাতীয় স্তরের বহু নেতাকে তিনি এই উৎসবের পটভূমিতে নিয়ে এসেছিলেন। সারা দেশে এর পর হতে শিবাজী উৎসব পালিত হয়। বাংলায় শিবাজী উৎসব পালিত হলো ১৯০২ এ। ১৯০৪ এ 'শিবাজী উৎসব' উপলক্ষে রবীন্দ্র নাথ 'শিবাজী উৎসব' রচনা করেন। তার দু বছর পর শিবাজী উৎসবের সাথে ভবানী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে পূজিত হলো। এই উৎসবের উদ্যোক্তা ছিলেন সখারাম গনেশ দেউস্কর। ভবানী মূর্তি পূজোকে কেন্দ্র করে পৌত্তলিকতা ও হিন্দু ভাবনা আনার ব্যাপারে অনেকে সমালোচনা শুরু

করলেন। বিপিন চন্দ্র সেই সময় রচনা করলেন 'শিবাজী উৎসব'। প্রকাশিত হলো 'বঙ্গ দর্শনে'র ভাদ্র সংখ্যা, ১৩১৩, (১৯০৬)। এবং 'শিবাজী উৎসব ও ভবানী মূর্তি' প্রকাশিত আশ্বিন মাসের 'বঙ্গ দর্শনে'র সংখ্যায়, ১৩১৩ (১৯০৬)।

'শিবাজী উৎসব' প্রবন্ধে বিপিন চন্দ্র বললেন "রাজকীয় অত্যাচারের প্রতিবিধানই শিবাজীর জীবনের মুখ্য লক্ষ্য বা এক মাত্র শিক্ষা নয়। .... মোগল অত্যাচারের প্রতিরোধ শিবাজীর জীবনের আত্যন্তিক দিক। এই বস্তুকে ধরিয়া শিবাজী আমাদের জাতীয় জীবনের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানাদিতে কদাপি সনাতন স্থান লাভ করিতে পারিবেন না।" তিনি বলছেন "আধুনিক কালের সর্বপ্রথম ও সর্ব প্রধান হিন্দু নেশন রচয়িতা ও হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা রূপেই শিবাজী আমাদের বরণীয় ও পূজার্হ হইয়াছেন। ..... এই ভাবে শিবাজীকে ধ্যান করিতে গেলে মোগলের অত্যাচার কাহিনী স্মরণ করা আবশ্যকও নহে।" ধর্মীয় প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিপিন চন্দ্র বলছেন, "রাজনীতিকে ধর্ম নিরপেক্ষ করা সহজ। ইংরেজ ভারতে তাহা করিয়াছে। কিন্তু জাতীয় জীবনকে ধর্ম নিরপেক্ষ করিতে গেলে তাহার অস্থিহানি হইবেই হইবে। ধর্মকে যদি জাতীয় জীবনের বাহিরে না রাখিতে হয়, তবে হিন্দু মুসলমানে মিলিত হইয়া ভারতে এক বিশাল জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা হইবে কি রূপে?" তিনি ধর্মীয় ঐক্যের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করছেন "ভারতের ভবিষ্যত জাতীয় জীবন ফেডারেশনের আদর্শে গঠিত হইবে। এই জীবনের এক অঙ্গ হিন্দু, অপর অঙ্গ মুসলমান, তৃতীয় অঙ্গ খৃষ্টান থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু ইহারা প্রত্যেকে আপন আপন বিশেষত্বকে রক্ষা করিয়া ও সেই বিশেষত্বেরই বিকাশ সাধনের দ্বারা ভারতের সাধারণ জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট করিবে।"

'শিবাজী উৎসব ও ভবানী মূর্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বললেন "শিবাজীর বীর চরিত্র ও স্বদেশ প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রচার করা ও প্রতিষ্ঠা

করা এবং শিক্ষিত জনসাধারণকে যথা সম্ভব শিবাজী চরিত্র লাভে সাহায্য করা, ইহাই শিবাজী উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এবারে উৎসব ক্ষেত্রে শিবাজী, রামদাস ও সিংহ বাহিনী ভবানী মূর্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।" এই ভাবনার পিছনে কারণ হিসেবে তিনি বলছেন "কোনো ভক্তকে বুঝিতে গেলে যে ভাবে তিনি ভগবানকে ভজনা করতেন সে ভাব তোমার চক্ষে ভালো হউক আর মন্দ হউক সেই ভাবেই তাহাকে দেখিতে হইবে।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলছেন "আমাদের আজকালকার ভাব ও ভাষায় শিবাজীর এই উদ্দীপনা ও প্রেরণা ব্যক্ত করিতে গেলে আমরা ইহাকে জাতীয় শক্তি নামে হয়ত অভিহিত করিব। যখন যে দেশে যে কোন ব্যক্তি স্বদেশ ও স্বজাতির উদ্ধার সাধনে বদ্ধ পরিকর হন, তখনই তাহার মধ্যে এই শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে। এই জাতীয় মহাশক্তি, এই Spirit of the race - এর দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ না হইলে, কেহ কদাপি স্বদেশের জন্য সত্যভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে পারে না। .... ইহুদিরা রোমক শৃঙ্খলা বদ্ধ হইয়া, যৃষ্ট জন্মকালে, এই মহাশক্তিকে – আমাদের এই সনাতন Spirit of the race কেই মশি বা Messiah নামে অভিহিত ও তাহার প্রতীক্ষায় পরাধীনতার সমুদয় ক্লেশ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ছিল। ফরাসী বিপ্লবকালে ফরাসীরা এই মহাশক্তিকেই স্বাধীনতা(Liberty) নামে ভজনা করিয়াছিল। ..... জাপানবাসীগণ মিকাডোর মধ্যেই আপনাদের এই Race Spirit কেই প্রত্যক্ষ করে, এবং স্বজাতির সনাতন মহাশক্তি ও মহাপ্রাণতার প্রকট মূর্তি ও প্রত্যক্ষ বিগ্রহ রূপেই তাহার চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়া একই সঙ্গে দেশ ভক্তি ও রাজ ভক্তির চরম চরিতার্থতা লাভ করিয়া থাকে। এই জাতীয় শক্তি এই Spirit of the race ই শিবাজীর নিকট ভবানী রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।" বিপিন চন্দ্র পাল শিবাজী উৎসবের সার্থকতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্তব্য করছেন ....."The strength and inspiration of which we sadly need at the present day for the reconstruction of our new national life. It is for this reason we regard the Shivaji celebration as a sacrament of the new civic life in India, and willing to lend it our most cordial support."

' কংগ্রেসী কথা ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ' বঙ্গ দর্শনে ' ( নভেম্বর - ডিসেম্বর - ১৯০৬ ) । ১৮৮৫ সালের কংগ্রেস তখন প্রায় বিশ বৎসর ভারতের রাজনীতিতে অবস্থান করছে । কংগ্রেস কে ঘিরে মানুষের সংশয় ও জিজ্ঞাসা । কংগ্রেস স্বায়ত্ব শাসন চাইছে না , সুশাসন প্রবক্তাদের মুখে বিভিন্ন ধরণের উক্তি । বিপিন চন্দ্র এই পরিস্থিতি সম্পর্কে লিখলেন " ভারতের বৃটিশ শাসন কর্তৃপক্ষকে প্রধানত দুইটি শ্রেনীতে বিভক্ত করিতে পারা যায় – এক দল শক্তি-উপাসক , আর এক দল বৈষ্ণবী মায়ার অনুচর । একদলের অস্ত্র তরবারী আর একদলের অস্ত্র সম্মোহন বাণ । ডালহৌসি , লীটন প্রভৃতি সকলেই স্বল্প বিস্তর শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন , ..... মেও , রিপন প্রভৃতি বৈষ্ণব – ভারত শাসনে বৈষ্ণবী মায়ার বিস্তার করিতে চাহিয়াছেন । " বিপিন চন্দ্র হিউমকে মনে করতেন দ্বিতীয় শ্রেনীর লোক । তিনি বলছেন " .... রিপন , হিউম , কটন প্রভৃতি উদার মতি ইংরেজগণের চিরন্তন লক্ষ্য – সুশাসন – গুড গভর্নমেন্ট , কংগ্রেসেরও সনাতন আদর্শ সুশাসন ও সত্য স্বায়ত্ব শাসন নহে । ইঁহারা স্বায়ত্ব শাসন চান না বা চান নাই যে , তা নয় । সেখানে সুশাসনের জন্য স্বায়ত্ব শাসন অত্যাবশ্যক সেখানে ইহারা সকলে স্বায়ত্বশাসনও চাহিয়াছেন । কিন্তু সুশাসন ইহাদের লক্ষ্য স্বায়ত্ব শাসন উপলক্ষ্য মাত্র । " বিপিন চন্দ্র কংগ্রেসের 'Mendicant policy' র বিরোধিতা করে বলেছেন " সুশাসনের পন্থা ছিল আবেদন ও আন্দোলন , স্বায়ত্ব শাসনের মূল মন্ত্র হইবে বোধন ও গঠন , – প্রজাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা .... প্রজা শক্তিকে বিবিধ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের আকারে গড়িয়া তোলা । "

তদানীন্তন ভারতে কংগ্রেসের আবেদন নিবেদন নীতির প্রচুর সমালোচনা হচ্ছিল । এই সমালোচনার ঢেউ বঙ্গভঙ্গ চলাকালীন সময়ে আরও তীব্র হয় ।

জাতীয়তাবাদী লেখকরা এই আবেদন নিবেদনের প্রতি কটাক্ষ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই আবেদন নিবেদনের রাজনীতি 'জয় রাধে ভিক্ষা দাও গো' রাজনীতির সাথে তুলনা করেছেন। এই নীতি সম্পর্কে বিপিন চন্দ্র আপন অভিমত ব্যক্ত করলেন তাঁর 'আবেদন ও আন্দোলন' প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'ভারতী'র ১৩১৩ সালের ফাল্গুনে (১৯০৭)। বিপিন চন্দ্রের উক্তি " আবেদনের মূলে সর্বত্রই দুইটি ভাব লুকাইয়া থাকে। এক – আপনার শক্তি সাধ্যে ঐকান্তিক বিশ্বাস, অপর – যাহার নিকটে আবেদন উপস্থিত করা যায়, তাহার শক্তি ও সদিচ্ছার উপর অচল আস্থা।" আত্মশক্তি ও আত্ম বিশ্বাসহীন জাতির পক্ষে স্বাধীনতা পাওয়া খুবই কষ্টকর। তিনি বলছেন " আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস ধর্মরাজ্যে অমূল্য বস্তু। এই অবিশ্বাস হইতেই এমে ভগবদ্ভক্তি জাগ্রত হইয়া জীবের ভব বন্ধন মোচন করিয়া দেয়। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রজার আত্ম শক্তির উপরে ঐ রূপ ঐকান্তিক অনাস্থা অতিশয় সাংঘাতিক বস্তু। ইহাতে অবস্থা বিশেষে রাজভক্তি জাগ্রত হইতে পারে, কিন্তু রাজ বন্ধন কদাপি শিথিল হয় না।" তিনি বলছেন, " আত্ম প্রতিষ্ঠা যেখানে যেখানে লক্ষ্য, আত্ম চেষ্টা সেখানে এক মাত্র ধর্ম। আত্ম নিবেদনে প্রকৃত আত্ম চেষ্টার মূল বিনষ্ট করিয়া ফেলে, এইজন্য রাজনীতি ক্ষেত্রে আবেদন - নিবেদন কদাপি মোক্ষ হেতু হইতেই পারে না।" বিপিন চন্দ্র বিশ্বাস করতেন ইংরেজ শাসনের একটি মাত্র উদ্দেশ্য তা হচ্ছে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি। তাঁর বক্তব্য " ইংরেজের এই অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঔদার্য ও সদিচ্ছার উপরেই আমাদের সর্ববিধ রাজ - নৈতিক আবেদন আন্দোলন অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই আবেদন নীতির অসারতা ও অকার্যকারিতা ভালো করিয়া বুঝিতে গেলে ভারতে ব্রিটিশ শাসন নীতির কুটিল গতি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করিতে হয়। এতকাল পর্যন্ত আমরা ইহা করি নাই বলিয়াই আমাদের সর্বাধিক রাজনৈতিক প্রয়াস এ রূপ ভাবে নিষ্ফল হইয়াছে।

'রাজভক্তি' প্রবন্ধে ( বঙ্গ দর্শন, শ্রাবণ, ১৩১৪, জুলাই - আগষ্ট, ১৯০৭ ) বিপিন চন্দ্র বলছেন, " আমরাও বলি অপরেও বলেন যে আমরা চিরদিনই বড় রাজভক্ত। কথাটার দোষ কত, সকল সময় ঠিক বুঝিয়া উঠা যায় না।

একথা সত্য যে প্রচলিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতায় রাজায় রাজায় বাদবিসম্বাদের কথা অনেক দেখতে পাওয়া যায় । কিন্তু রাজায় প্রজায় হানাহানির ঘটনা একান্ত বিরল । " তিনি বলছেন " রাজা - প্রজার সম্বন্ধ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত । ... ধর্মাবতার রূপেই রাজা পূজনীয় । ধর্মরক্ষক রূপেই তিনি বরণীয় । হিন্দুর রাজ - ভক্তি রাজা যেতাব ধারী ব্যক্তিটির প্রতি অন্ধ আনুগত্য নয় , একথা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে তিনি মন্তব্য করেন — হিন্দু রাজাকে এই জন্য সর্বদা ধর্মভীরু হইয়া চলিতে হয় , কারণ রাজা যদি ধর্মকে পরিত্যাগ করেন , রাজভক্তি আশ্রয়হীন হইয়া তাঁহাকেও নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিবে । " এই প্রসঙ্গে তিনি উদাহরণ দিয়ে বলছেন , " যে রাজা ধর্মকে পরিত্যাগ করে , সে আত্মাধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে । প্রজার বশ্যতার উপরে তাহার আর কোন দাবি দাওয়া নাই । সে তখন রাজা নহে আততায়ী মাত্র । তাহার বিরোধী হইলে রাজদ্রোহিতা হয় না । ইহাই হিন্দু আদর্শ । ..... এই আদর্শ অনুসারে প্রথম চার্লসের বিরুদ্ধে বৃটিশ প্রজাবর্গের অস্ত্রধারণ — রাজদ্রোহিতা পদবাচ্য কদাচিৎ হইতে পারে না । " ব্রিটিশ শাসনে ভীত সমাজে এরূপ বলিষ্ঠ রচনা খুবই কম লক্ষ্য করা যায় ।

বিপিন চন্দ্র পালের অপর একটি প্রবন্ধ ' ইজ্জৎ ' নামে প্রকাশিত হয় ১৩১০ সালের শ্রাবণের ' বঙ্গ দর্শনে । (জুলাই - আগষ্ট , ১৯০৮ ) । প্রবন্ধটি ' শ্রী ' র ছদ্মনামে প্রকাশিত হয় । ' ইজ্জৎ ' যে শুধু ইংরাজের অধিকার আছে তা নয় । সকলেরই অধিকার আছে । বিপিন চন্দ্র বলছেন , " প্রজার নিকট অকৃত্রিম ভক্তি লাভ করা দুর্লভ হইয়া উঠিলে রাজার পক্ষে ইজ্জৎ রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে । কৃত্রিম শাসন – কৌশলে ফল হয় না । ..... রাজার নিকট অকৃত্রিম সুশাসন লাভ করা দুর্লভ হইয়া উঠিলে প্রজার পক্ষেও ইজ্জৎ রক্ষা কঠিন হইয়া পড়ে । কৃত্রিম আন্দোলন – কৌশলে ফল হয় না । ... রাজার নিকট অকৃত্রিম সুশাসন লাভ করা দুর্লভ হইয়া উঠিলে প্রজার পক্ষেও ইজ্জৎ রক্ষা কঠিন হইয়া পড়ে । কৃত্রিম আন্দোলন – কৌশলে ফল হয় না । বরং সুশাসন আদায় করিয়া লইবার কৃত্রিম চেষ্টায় অকৃত্রিম সুশাসন আরও দুর্লভ হইয়া দাঁড়ায় । " তিনি ব্রিটিশদের সাবধানী বাণী

উচ্চারণ করে বলেন " এতদিন একতারকা ইজ্জতের ধূমপুঞ্জে গগন মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল । এখন তাহার মধ্যে প্রজার ইজ্জৎ বিদ্যুদ্দামের মত ঝলসিয়া উঠিতেছে ।" তাই বিপ্লববাদের সম্ভাবনা দেখে তিনি মন্তব্য করছেন " অক্ষমের বিদ্বেষ চিরদিন যে গোপন পথে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে , সেই চির - পরিচিত পুরাতন পথেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । "

বিপিন চন্দ্র স্বদেশী আন্দোলন সময়বর্তী কালে কিছু কবিতা গান রচনা করেন । এর মধ্যে কিছু কবিতা বঙ্গ দর্শনে প্রকাশিত হয় এবং কিছু কবিতা ' নারায়ণ ' পত্রিকায় । বঙ্গদর্শনের কার্তিক , ১৩১২ ( অক্টোবর , নভেম্বর , ১৯০৫ ) সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (১) স্বদেশ (২) ব্রত (৩) ভিখারী (৪) উপনয়ন (৫) আগ্নেয়গিরি (৬) প্রলয় এবং (৭) বঙ্গ বিভাগ । বৈশাখ , ১৩১৩ সালের বঙ্গ দর্শনের সংখ্যায় ( এপ্রিল , ১৯০৬ ) প্রকাশিত হয় (১) পূজারী (২) জীর্ণতরী (৩) পান্থ পাদপ (৪) সন্ন্যাস । বিপিন চন্দ্র পালের প্রায় সকল কবিতাই দেশ প্রেমের অনুরাগে সরস ও অনুপ্রাণিত । বঙ্গভঙ্গ জনিত রাজনৈতিক পটভূমিতে বিপিন চন্দ্রের মানসিক অনুভূতি ও হৃদয়ের প্রাঞ্জল ভাবনা নিশ্রিত কবিতাগুলি অপূর্ব ।

ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে অসমান বিধুর পরিবেশ কবির চিত্ত তলকে বেদনার্ত করে তুলেছিল । তবু শত শত বৎসরের লাঞ্ছনার অমোঘ কাল রাত্রি অতিবাহিত করে আজ স্বদেশ জাগছে । কবির ভাষায় —

" বেদনার মাঝে আজি জেগেছে চেতনা ,
পেয়েছি তোমার দেখা হে মোর স্বদেশ ,
নত আঁখি জল ভরা ছিন্ন চীর বেশ
শিয়রে দাঁড়ায়ে আর কথা কহিছ না । "

বেদনা ঘন রূপে কবি স্বদেশকে প্রত্যক্ষ করছেন —

" অতীত গৌরব তব , ভবিষ্যের আশা ,
আজিকার যাহা কিছু – বিদেশীর পায়ে
নিঃশেষ দিয়াছি ঢেলে । একি হেরি আজ
ভিখারীর বেশে তুমি ওগো রাজ রাজ । "

বঙ্গভঙ্গ জনিত অশান্ত পরিবেশে নারী জাগরণের কবিতা ' ব্রত ' । তিনি বঙ্গ নারীকে স্বদেশ ব্রতে উদ্দীপ্ত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন –

' ওগো বঙ্গ কুলাঙ্গনা সতী লক্ষ্মীগণ ,
আজি বঙ্গমাতা কাঁদি তোমাদের দ্বারে
হানিছেন কর । নিরাশ কোরো না তারে । '

বঙ্গমাতা কি চাইছেন ? —

' ... শুধু চাহিছেন তিনি
রমণীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত উদযাপনা
তোমাদের ঘরে । যার পুণ্যফলে যিনি
লভে পৌরুষ রতন – মৃত কোহিনূর
ভারতের । দেশহিত ব্রত ধারিনীর
কল্যাণীর বরমাল্যে দৈন্য হবে দূর
পুরুষের, স্তনে তাঁর শিশু হবে ধীর,
মাধী তার ভ্রাতৃ হস্ত বল দিবে আনি
তবে ভুলিবেন মাতা সর্ব দুঃখ গ্লানি । '

' উপনয়ন ' এ কবি মঙ্গলবে অগ্নিহোত্রী হতে আহ্বান জানাচ্ছেন —

' আজি এই মঙ্গল প্রত্যুষে
তব যজ্ঞকুণ্ড হতে যজ্ঞানল লয়ে
গৃহে ফিরি যাই সবে অগ্নিহোত্রী হয়ে । '

' আগ্নেয় গিরি ' তে কবির হৃদয় স্বদেশের লাঞ্ছনা ভাবে অগ্নি দহন শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়ে বানী তোলে —

' হে মোর স্বদেশ শুধু ধক ধক জ্বলে
শ্রাবণের চিতা বক্ষ মাঝে রাত্রি দিন ,

' প্রলয় ' কাল উপস্থিত হলে কবি অনুভব করছেন —

' সেই দিন ভারতের চির বিভাবরী
হবে সুপ্রভাত । দ্বাদশ আদিত্যগণ
আনিবেন ভারতের মহা জাগরণ । '

' বঙ্গ বিভাগ ' কবির জীবনের সুতীব্র অনুভূতির ফসল । স্বদেশী যুগে বহু আলোচিত , পঠিত কবিতা —

' রাজার শাণিত খড়্গ নিষ্ঠুর আঘাতে
পারেনি করিতে দ্বিধা তোমার স্বদেশ
শুধু ভাঙিয়াছে তব নিদ্রার আবেশ ,
দিয়াছে চেতনা । আজি নবীন প্রভাতে

যুগযুগান্তরের সুপ্ত নিমীলিত আঁখি
মেলিয়াছে , হেরিতেছ তরবারি লেখা
বিদারণ রেখাগুলি স্থির দৃষ্টি রাখি
রুধিরাক্ত বক্ষোপরি । শুধু ক্ষুণ্ন রেখা ,
ছিন্ন করে সাধ্য কার পূত দেহ তব
কুলিশ কঠোর ? এই ব্যবচ্ছেদ - খাদ
ভরিয়া বহিয়া যাব উদার্য ভৈরব
বর্ষবক্ষ: ক্ত বিগলিত মেঘনাদ ,
মও গঙ্গা পুণ্য স্পর্শ যার দিবে প্রাণ
সহস্র সন্তানে , দিবে বরাভয় দান ।

কবি নিজেকে স্বদেশ মন্দিরের ' পূজারী ' রূপে দেখেছেন । তাঁর কামনা —

তোমার স্বাক্ষর লিপি ভালে লিখি দিলে ,
নিষ্ফল জীবন মোর সার্থক করিলে ।

' জীর্ণতরী ' রূপী স্বদেশকে যে বণিক দল ডোবাতে চাইছে সে সম্পর্কে কবির দেশবাসীর কাছে অনুরোধ —

' . . . . . হে নব সংসারি ,
আবার বাঁধিয়া বুক লয়ে শত দাঁড়ী
তরাপালে নবোৎসাহে দাও তবে পাড়ী । '

স্বদেশী যুগের আন্দোলন একদিন জয়ী হয়েছিল । বঙ্গভঙ্গ রোধ হয়েছিল । বিপিন চন্দ্রের লেখনী স্তব্ধ হয় নি । তার চিন্তাধারা পরবর্তী আন্দোলন সময়বর্তী কালে সাড়া জাগিয়েছিল । বিপিন পালের স্বদেশী জাগরণের অবদান সম্পর্কে বিনয় কুমার সরকার মন্তব্য করেছেন " আমার বিচারে সে যুগের আসল নেতা

বিপিন পাল । ১৯০৫ সনের আগষ্ট হতে ১৯০৮ সন পর্য্যন্ত বাঙালী জাতকে জাতি তোলবার ভার ছিল বিপিন পালের হাতে । বিপিন পালের গলার আওয়াজ না শুনে যুবক বাংলার জন্ম হত না । বিদ্যায় , দার্শানিকতায় , রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানে , বিপ্লব যোগে , কর্ত্তব্য নিষ্ঠায় বিপিন পালের ঠাঁই উঁচু ছিল । ..... এই জন্য আমি বিপিন পালকে বঙ্গ বিপ্লবের জন্মদাতা ও নেতা বলে সম্বর্ধনা করে থাকি । " ৪৭

## চিত্তরঞ্জন দাশ ( ১৮৭০ - ১৯২৫ )

স্বদেশী আন্দোলন রাজনৈতিক জগতে বিবিধ ধারার প্রবর্তন করেছিল । এক দিকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অন্যদিকে সশস্ত্র সংগ্রামবাদে বিশ্বাসী বিপ্লব পন্থ দেশবন্ধু ছিলেন এই দুট পন্থার মধ্য পন্থী । জীবনের অনেক ঘাত প্রতিঘাতে তিনি রাজনৈতিক জগতে এসেছিলেন । ছাত্র জীবনে তিনি সুরেন্দ্র নাথ ও আনন্দ - মোহন বসুর সংস্পর্শে এসে ' স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েসনে ' রাজনীতির অভিজ্ঞতা লাভ করেন । ইংলন্ডে থাকা কালীন সময়ে দাদাভাই নৌরজীর সংসদীয় নির্বাচনে এক নিষ্ঠ ভাবে অংশ গ্রহণ করেন । রাজনীতির কর্মপ্রবাহে সেই সময় থেকে তাঁর প্রবেশ ।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পটভূমি ছিল উদ্দীপ্ত । কংগ্রেসও আন্দোলনের ব্যাপারে দ্বিধা বিভক্ত । ১৯০৬ এর কলকাতা অধিবেশনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন । তখন কংগ্রেস মডারেট বা নরম পন্থীদের হাতে । তাঁদের সুরই কংগ্রেসের সুর স্বদেশী যুগের বয়কট আন্দোলনকে কংগ্রেসী নেতারা গ্রহণ করেন নি । বিপ্লব

পন্থায় বিশ্বাসীর সংখ্যা কংগ্রেসে তখন নগন্য। ১৯০৭ থেকে পাড়া দেশে বিপ্লব বাদের শুরু। কিন্তু উদ্দীপ্ত বিদ্যুৎ ঝলকেই দ্রুত শেষ হয়ে বিপ্লবী কার্যা - সূচী। চরম পন্থীরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। তিলক, বিপিন চন্দ্র, লালা - লাজপত রায় এরা সবাই অন্তরীণ। চিত্তরঞ্জন বেছে নিলেন সেই যুগে নিজেকে নিয়োজিত করতে।

বৈষ্ণবীয় চিন্তার সাধক বলছেন 'I look upon the attainment of freedom and Swaraj the only way of fulfilling, one self as individuals as nations. I look upon all national activities as the real foundation of the service of that greater humanity which again is the revealation of God to man". ৪৮

স্বরাজ শব্দটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলছেন, "Swaraj is definable, and is not to be confessed with any particular system of government. There is all the difference in the world between Swarajya and Samrajya. Swaraj is the natural expression of the national mind. The full out ward expression of the mind covers and must necessarily cover, the whole life history of a nation.....The question of nationalism, therefore looked at from another point of view, is the same questions as the Swaraj". ৪৯

দেশবন্ধু স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে বলছেন " স্বদেশী আন্দোলন একটা ঝড়ের মতো বহিয়া গিয়াছিল, একটা প্রবল বন্যায় আমাদের ভাসাইয়া লইয়া

গিয়াছিল। প্রাণ যখন জাগে তখনও হিসাব করিয়া জাগে না। ..... এই যে মহাবন্যার কথা বলিলাম, তাহাতে আমরা ভাসিয়া, ডুবিয়া বাঁচিয়াছি। বাঙলার যে জীবন্ত প্রাণ তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাঙ্গলার প্রাণে প্রাণে অবস্থান যে সত্যতা ও সাধনার স্রোত, তাহাতে অবগাহন করিয়াছি। ..... বুঝিলাম, কেন ইংরেজ এ দেশে আসিল, বুঝিলাম রামমোহনের তপস্যার নিগূঢ় মর্ম্ম কি? বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্ত্তি সেই —

" তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে — "

সেই মাকে দেখিলাম।

স্বদেশী আন্দোলন হিসাব না করিয়াই আসিয়াছিল। হিসাব না করিয়াই চলিয়া গেল। কিন্তু এখন আমাদের হিসেব করিবার সময় আসিয়াছে। মা দেখা দিয়াছেন — এখন যে পূজার আয়োজন করিতে হইবে। ..... এই যে মহাবন্যায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল, এখন যে সব পতিত জমি আবাদ করিয়া সোনা ফলাইতে হইবে। বিশ্বাস রাখিও সোনা ফলিবেই। " ৫৭

বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন কার্যাকর হলো সেই ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ এ চিত্তরঞ্জন ছিলেন দার্জিলিং-এ। সেখানে সেদিন তাঁর রচিত প্রবন্ধ 'স্বদেশী আন্দোলনের কথা' পাঠ করেন। তিনি বলছেন, " এই যে নবজীবন সঞ্চারিণী আশা — যাহা আমাদের দেশটাকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছে ইহা কি এক-মাত্র দারিদ্র বিনাশের স্বরূপ? ইহার মধ্যে কি গভীরতর সত্য নিহিত নাই? ইহা কি আমাদিগকে চক্ষে আঙুল দিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতেছে না? ইহা কি বাঙ্গালী জাতির শ্রবণ

বিবরে এব আশ্চর্য্য অপূর্ব স্বাধীনতা সঙ্গীত ঢালিয়া দিতেছে না ? আমার কাছে এই নব আন্দোলন যে যে কারণে সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় , তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান স্মরণ এই যে , ইহা ফলত ও মূলত বাঙালী জাতির আত্ম নির্ভর পথে প্রথম পদক্ষেপ । এই কারণেই আমার ধ্রুব ধারণা যে এই আন্দোলনের সফলতার উপরেই আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা নির্ভর করিতেছে । "

তিনি বলছেন , " প্রত্যেকব্যক্তির যেমন আপনার মুক্তি আপনাকেই সাধন করিয়া লইতে হয় সেই রূপ প্রত্যেক জাতির মুক্তিও সেই জাতিকেই সাধন করিয়া লইতে হয় , সেই রূপ প্রত্যেক জাতির মুক্তিও সেই জাতিকেই সাধন করিয়া লইতে হইবে । সহস্র বৎসর ধরিয়া অন্য জাতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলেও প্রকৃত মুক্তির পথ কখনও মিলিবে না । "

আমরা এতদিন যে ইংরাজের মুখাপেক্ষী হয়েছিলাম তার কারণ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন " ইংরাজ যখন প্রথমে আমাদের দেশে আসে তখন নানা কারণে জাতীয় জীবন দুর্বলতার আধার হইয়াছিল । তখন আমাদের ধর্ম্ম একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল । একদিকে চির পুরাতন চির শক্তির আকর সনাতন হিন্দু ধর্ম , কেবল মাত্র মন্ত্রের মৌখিক আবৃত্তি ও আড়ম্বরের মধ্যে আপনার শিব - শক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল । অপরদিকে যে অপূর্ব প্রেম ধর্ম্ম বলে মহাত্মা চৈতন্য সমস্ত বাঙ্গালা দেশকে জয় করিয়াছিলেন সেই প্রেম ধর্ম্মের অনন্ত মহিমা ও প্রাণ সঞ্চারিণী শক্তি কেবল মাত্র মালা ঠোকাইতেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছিল , আর আমাদের সমগ্র ধর্ম্মক্ষেত্র শক্তিহীন শক্তি ও প্রেম শূন্য বৈষ্ণবের ধর্ম্ম শূন্য কলহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল । ..... এইরূপ কি ধর্ম্মে কি জ্ঞানে বাঙালী তখন সর্ববিষয়ে প্রাণহীন মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছিল । এমন কি বাঙ্গালীর বলবীর্য্য পর্য্যন্ত তখন নিতান্ত কৃত্রিমের মত সমস্ত বাঙ্গালী জাতির গলদেশ সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা চালাইতে ব্যস্ত ছিল । "

ইংরেজদের প্রতি মোহাবিষ্ট জাতিকে তিনি কশাঘাত করে বলছেন, " আমরা মোহ মুগ্ধ হইয়া একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে ইংরাজের ইতিহাস ইংরাজের জাতীয় জীবনের প্রতিমা আমাদের নহে, ইংরাজের সাহিত্য ইংরাজেরই জাতীয় জীবন পুষ্ট করিতে পারে, তাহার সহিত আমাদের জাতীয় জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই, ইংরাজের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধিতে আমাদের মাতার দৈন্য কিছুতেই ঘুচে না ও ইংরাজের গৌরবে আমাদের লজ্জা কিছুতেই নিবারণ হয় না, ইহা অতি সোজা কথা — অত্যন্ত সরল সত্য।"

তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আরম্ভে জাতীয় জীবনের দুর্বার গতিকে অবলোকন করে মন্তব্য করছেন " আজ ভগবৎ প্রসাদে আমাদের জাতীয় জীবন হইতে মরণ - ছায়া রূপী এই মহামায়া কুহেলিকা অপসৃত হইয়া গিয়াছে। এই নবোন্মেষিত জাতীয়ত্বের প্রভাত লোকে আমাদের জাতীয় জীবনের সত্য অবস্থা আমাদের চক্ষের সম্মুখে সুন্দর — পরিষ্কার রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।" তিনি ভাবাবেগে বলছেন, " আজিকার দিনে এই যে দেশব্যাপী আন্দোলনে শত কন্ঠে উচ্চারিত ' বন্দেমাতরম ' ধ্বনির মধ্যেও যে মাতার আহ্বান শুনিতে পায় নাই, সে নিতান্ত হতভাগ্য। আর যে ডাক শুনিয়াছে, কিন্তু শুনিয়াও আপনার ছোট খাট স্বার্থগুলিকে সম্মুখে ধরিয়া আপনার মস্তিষ্ক হইতে আকৃষ্ট মিথ্যা তর্করাশি এবং আপনার করুণা বাভিষ্কৃত হৃদয় জাত শুষ্ক তুচ্ছ উপহাসের অন্তরালে আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, সে সরকারী উকিলই, বা ছোট কি বড় রকমের সরকারী জজই হউক, কি সামান্য কেরাণী কি সামান্যতর ক্লার্কই হউক — সে মাতা ও বিধাতার অপমান করিতেছে — সে মাতৃদ্রোহী — ঈশ্বর দ্রোহী, তুষানলেও তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হয় না।"

বয়কট ও স্বদেশী প্রসঙ্গে তিনি বলছেন " আমি কখনই স্বীকার করিব না যে Boycott বিদ্বেষ ভাবাপন্ন। Boycott ও স্বদেশীয়তা এ দুই স্বদেশ প্রেম ভাবাপন্ন। বৈষ্ণব কবিদের ভাষায় বলিতে গেলে ' বয়কট ' পূর্বরাগ, স্বদেশীয়তা মিলন। মাতার আহ্বান শুনিয়াছি বলিয়াই বিদেশী বিলাস পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কুলটা রমণীর ন্যায় বিলাতী বিলাস তাহার শত সহস্র ছলা কলা বিস্তার করিয়া তাহার অধরের হাসো, তাহার নয়নের ভঙ্গিমায়, তাহার সুন্দর হস্তের

কোমল পরশে আমাদিগকে একেবারে মোহমুগ্ধ করিয়া তাহার বাহু বন্ধনের মধ্যেই আমাদের সুখ নিদ্রার আয়োজন করিতেছিল। সেই বাহু বন্ধন হইতে আমাদিগকে একেবারে মুক্ত না করিলে কেমন করিয়া আমাদের চিরধৈর্যশীলা চির কল্যাণময়ী মাতা – যিনি এতদিন ধরিয়া তাঁহার গৃহ প্রাঙ্গনে কল্যাণ প্রদীপ জ্বালিয়া তাঁহার অকৃতজ্ঞ সন্তানের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন – তাহার পবিত্র কল্যাণময় প্রেম হৃদয়ে ধারণ করিব ? আর এই যে বিলাতী দ্রব্য বর্জন করিতেছি, ইহাতে কি প্রতিদিন আমরা সংযম শিক্ষা করিতেছি না ? সংযম ব্যতীত কখনও কি প্রেম স্থায়ী হয় ?" আমাদের এই বর্জনের মধ্য দিয়া স্বদেশ প্রেম সজীব হইয়া উঠিতেছে।

তিনি বয়কট - এর আরেকটি দিক তুলে ধরেছেন। " ইংরাজী অর্থশাস্ত্রে যাহাকে production বলে, তাহার জন্য demand আবশ্যক। আমরা বিলাতী দ্রব্য বর্জন করিয়া সেই demand এর সৃষ্টি করিতেছি। একবার যদি এর দ্বারা আমরা স্থায়ী demand দাঁড় করাইতে পারি আমাদের দেশের লুপ্ত ও নষ্ট বানিজ্য মাথা তুলিবেই তুলিবে।"

চিত্তরঞ্জনের জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবির বলেছেন "Every great national movement throws up a member of resplendent personalities who are partly its creators and partly its creation They are its creation, for without the background and impulse provided by the movement, their thought and action and could not have taken shape, or even if they did, would have remained still born and ineffective. They are also its creators, for they help to give form and direction to urges and impulses which till their emergence had stirred only is the subconscious mind of the people. Great men help to formulate and express the hopes and aspirations of an age, an in doing so bring their realisation within the range of practical politics". (১)

বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন ছিল এইরূপ এক বিশাল জাতীয় উত্থান। আর সেই যুগের রাজনীতি " তাঁকে চেয়েছিল, এবং "C.R.Das thread himself heart and soul into the struggle for India's emancipation". ৫২

## বিনয় কুমার সরকার (১৮৮৭ - ১৯৪৯)

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রায় সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক আন্দোলনের পৃষ্ঠভূমি হতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে রাজনৈতিক স্তরের ভাবভূমিতে বিচরণ করেছেন। কিন্তু বিনয় সরকারক্ষেত্র ছিল জাতীয় জীবনে শিক্ষকতা, এবং এই ক্ষেত্র হতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবনার পরিমন্ডলে বিরাজ করেছেন। এই বিরাজমান অবস্থায় তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কখনও ম্লান হয় নি। তাঁর জীবনীকার হরিদাস মুখোপাধ্যায় বলছেন, " বিনয় সরকারের সমগ্র আত্মিক জীবনটা, — বিশেষতঃ ১৯০৭ এর পরবর্তী জীবনটা — একটানা প্রতিবাদ আর বিদ্রোহ, বিদ্রোহের বানী এ যুগে বাঙালী অবাঙালী বহু নর-নারীর কণ্ঠেই শুনেছি। কিন্তু এত জোরের সঙ্গে সকল প্রকার ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বোধহয়, বিনয় সরকারের মতন খুব কম ব্যক্তির কণ্ঠ থেকেই বেরিয়েছে। " ৫৩

এমনকি ' দি ইন্ডিয়ান সোশ্যাল রিফরমার ' তার ২৮শে ডিসেম্বর , ১৯৪০ এর সংখ্যায় মন্তব্য করছে " রাজা রামমোহন রায় , কেশব চন্দ্র সেন , পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর , সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় , স্বামী বিবেকানন্দ , চিত্ত - রঞ্জন দাস এবং সুভাষ চন্দ্র বসু – এঁদের সকলই বাঙ্গার স্বাধীন প্রাণশক্তির – যা কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা মত বিশেষের নিকট নতজানু হয় না তার – মূর্ত প্রতীক। কিন্তু এঁদের থেকেও এই বিষয়ে আরও জীবন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিনয় কুমার সরকার। তিনি প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জ্ঞানরাজ্যের সকল প্রকার চিন্তাধারারই প্রতিবাদ করে থাকেন। " ৫৪

বিনয় কুমার ছিলেন উদার নীতির উন্নত হৃদয়ের মানুষ। দেশের মাটির প্রতি তাঁর গভীর টান ছিল। শিল্প বাণিজ্যের মাধ্যমে স্বদেশর প্রগতি চাইতেন তিনি। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতের এক যুগান্তবাহী প্রাচীন সংস্কৃতি আছে। যা দিয়ে বিশ্ব জয় করা যায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হতেই তিনি জীবনের নতুন ব্রত খুঁজে পেলেন। স্বাদেশিকতা বোধ তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র হলো। ছাত্র জীবন ছিল অসাধারণ মেধা সম্পন্ন। সরকারী বৃত্তি ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদের চাকরী প্রত্যাখান করে তিনি সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহযোগী হন। জাতীয় শিক্ষা পরি - যদের দ্বারা পরিচালিত 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে' অবৈতনিক অধ্যাপকের কাজ গ্রহণ করেন।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন তাঁকে রাজনৈতিক প্রদীপের পাদপীঠে নিয়ে এল। তিনি বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে মন্তব্য করছেন " আমার কাছে ১৯০৫ হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসর। এই সময় সুরু হয় গৌরবময় বঙ্গ বিপ্লব। এ একটা খাঁটি যুগান্তর। ..... ১৯১১ সনে গভর্ণমেন্ট দু - টুকরো করা বাংলাদেশকে পুন - রায় জুড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। এই কাজের ভিতরে যুবক বাঙ্গা রাষ্ট্রিক জয় - জয়কার মূর্তি পেয়েছিল। এ একটা বিপ্লব বা যুগান্তর। " ৫৫

স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে বিনয় কুমার অনুভব করতেন যে দেশ গঠনের কাজে বিদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারতীয়দের জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। সেইজন্য তিনি সতের জন কৃতি ছাত্রকে বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। এবং তিনিও ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ভ্রমন করেন। স্বদেশী যুগে বিনয় সরকার নিজের ভাবনাকে প্রকাশ করলেন তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধে।

১২০৬ এর জুন মাসে 'মালদহ সমাচার' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হলো তাঁর প্রবন্ধ "বাংলার জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও বঙ্গ সমাজ'। পরে এই প্রবন্ধ কলকাতার অমৃত বাজার পত্রিকায় ইংরাজীতে অনুদিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য বহু ছাত্র বিভিন্ন সরকারী বিদ্যালয় হতে বহিষ্কৃত হয়। এই সব ছাত্রদের শিক্ষা দানের জন্য গড়ে উঠে জাতীয় বিদ্যালয়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ এর কর্তাব্যক্তিরা এই জাতীয় বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করতেন। বিনয় সরকার এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি মালদহে ১২০৭ এর জুন মাসে মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই প্রবন্ধে জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ এর কার্যকরী ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখলেন, " যে কোনোনো বাঙালীই আজকাল বেশ জানে যে পেট চালানো দিন দিন কষ্টকর ও ব্যয় সাধ্য হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তথাকথিত শিক্ষিত লোক-জনের সম্মুখে আয়ের পথ হইতেছে মাত্র দুটি। প্রথমতঃ সরকারী চাকুরী আর দ্বিতীয়তঃ উকিলি ডাক্তারি ছাড়া উচ্চ শিক্ষিত বাঙালীরা রোজগারের কোন পথই ঢুঁড়িয়া পায় না। এই সকল বাঁধা পথের বাহিরে তাহাদের পক্ষে স্বপ্নেও চলা সম্ভব পর নয়। সাধারণতঃ কেহই এই সকল বাঁধা পথ স্বাধীন খেয়ালে ছাড়িয়া দিতে চায় না। আর একটা নতুন পথ আবিষ্কার করার দিকেও কেহ বড় একটা ঝুঁকে না। ফলতঃ ডাল ভাতের জোগার করা ক্রমশই যার পর নাই কঠিন হইয়া পড়িতেছে। যথোচিত ভাত - কাপড়ের অভাবে শিক্ষিত বাঙালী পরিবারকে

কষ্ট পাইতে হইতেছে । এই সকল দুরবস্থা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে চাই নতুন নতুন অন্নের পথ । বাঙলায় নরনারীর চোখের সামনে নতুন নতুন টাকা রোজগারের উপায় দেখাইয়া দিতে না পারিলে বাঙালীকে জীবন সংগ্রামে পরাস্ত হইতে হইবে । খাওয়া পরার উপায় উদ্ভাবন করাই বাঙালী জাতির পক্ষে মস্ত সমস্যা । এই জরুরি অভাব মোচনের জন্য , অন্ন সংস্থানের নতুন নতুন পথ সৃষ্টি করিবার জন্য বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ গঠিত হইয়াছে । এই পরিষদের ব্যবস্থায় যে শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক টেকনিক্যাল শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহার ফলে বাংলার জন সাধারণ নব নব প্রণালীতে আর্থিক অভাব মোচন করিবার সুযোগ পাইবে । জাতীয় শিক্ষা পরিষদের গোড়ার কথাই এই অর্থকরী বিদ্যা , ভাত কাপড় বিষয়ক বিদ্যার ব্যবস্থা । কৃষি শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা কর্মের দিকে যুবক বাংলার মাথা হাত পা তৈয়ারী করিয়া দিবার জন্য জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন আবির্ভূত হইয়াছে । দেশের ভিতরে যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি , সুযোগ ও সম্পদ আছে সেই গুলোকে বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক প্রণালীতে পুষ্ট করার দিকে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধানতম নজর থাকিবে । দেশের ধন সম্পদ যাহাতে বৃদ্ধি পাইতে পারে , জাতীয় ধন ভান্ডার যে যে কর্ম - কৌশলে পরিপুষ্ট হইতে পারে সেই সকল দিকে শিক্ষা প্রচার করিবার জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জন্ম ।

বর্তমান যুগে জাতীয় বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ভর্তি করার জন্য অভিভাবকেরা ভীত ও চিন্তিত ছিলেন । প্রধান কারণ ছিল দুটি (১) এই বিদ্যালয়ে তাদের ছেলে ভর্তি হলে ' বিপ্লবী ' বা ' স্বদেশী ' বলে চিহ্নিত হবে । (২) এই বিদ্যালয়ের সিলেবাস শেষ হওয়ার পর সরকারী চাকুরী পাবে কি না ? বা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পাবে কি না ? এই চিন্তাগুলোর জন্য এই প্রবন্ধে বিনয় সরকার বলছেন , " এই সকল ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার ভিতর ভাবুকতা , স্বার্থ - ত্যাগ ইত্যাদি কিছুই নাই । আছে নিজ নিজ অন্ন সংস্থানের আশা , ভবিষ্যৎ স্বার্থ সিদ্ধির ব্যবস্থা । ছেলেদেরকে জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করিলে কোনো পরিবারের

আর্থিক লোকসান হইবার সম্ভাবনা নাই , বরং লাভই আছে ষোলআনা । এই সকল বিদ্যালয় হইতে যে সকল ছেলেরা বাহির হইয়া আসিবে , তাহার দেশের ভিতর নতুন নতুন সম্পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে । তাহারা যে কেবল দেশ বা সমাজকে ঐশ্বর্যশালী বা ধনী করিয়া তুলবে তাহা নয় । সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নিজের পেট পূজার ব্যবস্থাও হইতে থাকিবে । প্রত্যেকেই নিজ নিজ ট্যাঁকেও রোজগারের টাকা আনিয়া জমাইতে পারিবে । এসব বস্তুর সঙ্গে জাতীয় শিক্ষার অচ্ছেদ সম্বন্ধ । জাতীয় শিক্ষা ষোল আনা বৈষয়িক আদর্শে গঠিত । "

তদানীন্তন পরিবেশ সম্পর্কে মন্তব্য করে বিনয় সরকার লিখছেন , " জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ইস্কুল - কলেজের শিক্ষা প্রণালীর ভিতর সমগ্র দেশের লোকের ভবিষ্যত জাতিগত সম্পদ বৃদ্ধি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে । অপর দিকে বেশ বুঝা যাইতেছে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন কি মামুলি অভাব মোচনের সুযোগও নেহাৎ কম । সকল দিকদিয়ে বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে , যে সকল পরিবারের কোনো বাঁধা পথ নাই তাহাদের পক্ষে জাতীয় বিদ্যালয়ে ছেলেদের কেতৈয়ার করিয়া লওয়াও সম্পদ বৃদ্ধির উপায় বটেই । অধিকন্তু যে সকল পরিবার বেশ স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতেছে তাহাদের পক্ষে ভবিষ্যতের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জাতীয় শিক্ষা - পরিষদের আশ্রয়ে ছেলেদেরকে হাত - পায় কাজে আর যন্ত্র ব্যবহারের কাজে গড়িয়া তোলা কর্তব্য । "

স্বদেশী শিক্ষার বাস্তব ভাবনার সাথে বিনয় সরকার আদর্শগত ভাবনাকেও উন্নত করেছিলেন । স্বদেশ চেতনার যে ব্রত এই ছাত্র সমাজের মধ্যে দেখাদিয়েছিল তাকে তিনি আন্তরিক ভাবে সমর্থন করেছেন । " যে লেখা পড়ার আবহাওয়ায় স্বদেশ সেবা বে-আইনী বিবেচিত হয় , সেই লেখা পড়া ছাড়িয়া দেওয়াই তাহারা মনুষ্যত্ব গঠনের সোপান রূপে গ্রহণ করে । সরকারী স্কুল আর সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করিয়া স্বদেশ সেবার মন্ত্র বজায় রাখিবার জন্য তাহারা

ব্রতবদ্ধ হইয়াছিল । যুবক - বাংলার এই পুণ্য বাহিনী বাঙালী জাতি কোন দিনই ভুলিতে পারিবে না । "

দেশের মানুষকে এই ব্রতে আহ্বান জানিয়ে বিনয় সরকার বলছেন , " এই সমুদয় কর্তব্য নিষ্ঠ স্বদেশ ব্রত ধারী যুবকগণের ভবিষ্যত উন্নতির সম্বন্ধে আশীর্বাদ করিবার জন্য কোন বাঙালী পরিবার আজ অগ্রসর হইবে না ? ত্যাগ মন্ত্রের এই সকল উপাসকদিগকে সহায় ও সঙ্গীহীন রূপে ফেলিয়া রাখিবার বাংলা দেশের কোন পিতামাতা ও অভিভাবক নিজ নিজ ছেলেদেরকে পরামর্শ দিবে ? নিজের ছেলেদিগের জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা আর কোনো সরকারী চাকরি হিসেবে বড় হইবার ব্যবস্থা করিয়া কোন বাঙালী পরিবার আজ পর্যন্ত এই সকল স্বার্থত্যাগী যুবক বৃন্দের কর্মরাশিকে অপমানিত করিতে সাহসী হইবে ? সেই সাহস আর সেই হৃদয় কোনো বাঙালীরই নাই । যদি বাংলা দেশে এমন কোনো লোক থাকে তবে সে রক্তমাংসের মানুষ নয় । মানুষের কলিজা , মানুষের হৃদয় , মানুষের চিত্ত প্রবৃত্তি তাহার নাই । সে নরাধম । "

সেযুগে কিছু লোকের স্বার্থপরতা তাঁকে আহত করেছিল । তিনি তাই মন্তব্য করছেন " এই অবস্থায় লোক দেখানো স্বদেশ সেবা , লোক দেখানো স্বজাতি নিষ্ঠা , আর লোক দেখানো স্বদেশী আন্দোলন ছাড়িয়া দিয়া নিজ নিজ তাত কাপড় আর টাক সামলাইতে লাগিয়া যাওয়াই শ্রেয়স্কর । স্বদেশী আন্দোলনকে যাহারা ভালবাসে তাহারা স্বদেশী আন্দোলনের জন্য স্বার্থত্যাগী এবং সরকারী ইস্কুল বর্জন - কারী ছাত্রদের সঙ্গে সহযোগিতা করিবে এইরূপই আশা করা যায় । "

বিনয় সরকার জাতীয় আন্দোলন চলাকালীন সময়ে বহু পুস্তক রচনা করেন । ১৯০৬ - ১৯১৪ সালের এই মধ্যবর্তী সময় কালীন তাঁর প্রবন্ধগুলি এই সব পত্রিকায়

প্রকাশিত হয়েছিল ।

(১) বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা (১৯০৭), ৫০ পৃষ্ঠা

(২) মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির কার্য্য পরিচালনা (১৯০৭) পৃষ্ঠা ১৬

(৩) শিক্ষা বিজ্ঞানের ভূমিকা (১৯১০) পৃষ্ঠা ৫৬

(৪) প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষা (১৯১০) ১৭৫ পৃষ্ঠা

(৫) ভাষা শিক্ষা (১৯১০) ১২০ ঐ

(৬) সংস্কৃত শিক্ষা চারভাগে (১৯১১) ৩২০ পৃষ্ঠা

(৭) শিক্ষা সমালোচনা (১৯১২) ১৫০ পৃষ্ঠা

(৮) নিগ্রো জাতির কর্মবীর (১৯১৪) ২৮০ পৃষ্ঠা

'শিক্ষা বিজ্ঞানের ভূমিকা'য় তিনি বলছেন " যে কোন দেশে এবং যে কোন যুগে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে । সেই দেশ ও সেই যুগের শিক্ষাগুরু - দিগকে ত দেশোপযোগী স্বাভাবিক এবং তৎকালোচিত 'আধুনিক' শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্তন করিতে হইবে । সেই সমাজের প্রকৃতি কি, কোথায় ইহার বিশেষত্ব, কোনো কোন বিষয়ে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং তৎকালের যুগধর্ম কি, অর্থাৎ সেই যুগে পৃথিবীতে কোন কোন ভাব ও কর্ম সমূহ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এবং তাহার দ্বারা কিরূপ নূতন অবস্থা সংঘটন হইয়াছে ও হইবার সম্ভাবনা এই সকল বিষয় আলোচনা না করিলে সকল শ্রমই পণ্ড হইয়া যায় । এই রূপ সমাজোপযোগী এবং 'আধুনিক' শিক্ষা পদ্ধতিকেই স্বাভাবিক বা জাতীয় শিক্ষা বলা হয় । ইহার দ্বারাই সেই জাতির তৎকালোপযোগী জীবন বিকাশের সুবিধা হয় । এবং ইহাতে সমাজ স্বীয় কর্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়া ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির সহায়তা করে এবং মানব সভ্যতার বিস্তৃতি ও বিকাশের উপযোগী হয় । " ৩৬

তিনি আরও বলছেন , " সমাজোপযোগিতা , স্বাধীনতা এবং কালোপযোগিতা প্রকৃত স্বাভাবিক শিক্ষার প্রধান লক্ষণ । তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষা ও জাতীয় ইতিহাস চেতনার উপর জোর দিয়েছিলেন । তিনি বলছেন " সুপরিচিত মাতৃভাষার শিক্ষা প্রণালী যেমন সকল ভাষা শিক্ষায় প্রয়োগ করিতে হইবে , তেমনি পরিচিত বর্তমান জাতীয় ইতিহাস আলোচনাকেই সকল ইতিহাস শিক্ষার ভিত্তিরূপে বিবেচনা করিতে হইবে । " ৫৭

বাঙালী জীবনে বিনয় সরকার যেন একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তি সত্তাকে অতিক্রম করে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল । তাঁকে কেন্দ্র করে বিশাল এক পণ্ডিত গোষ্ঠী' আবর্তিত হতো । তাঁর মতবাদ তদানীন্তন সময়ে('Sarkarism') নামে পরিচিত ছিল । তাঁর সম্পর্কে সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন " আজীবন কাল বিনয় কুমার দেশ ভক্তির আবেগে চালিত হন । যুক্তি-বাদী এবং আধুনিকতার অনুরাগী হলেও ভারতীয় সমাজ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি ছিলেন সমালোচনা বিমুখ । ভারত মহিমা প্রচার ও ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছিল তাঁর স্বপ্ন ও সাধনার বস্তু । নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তিনি সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন ও আন্দোলনের বিচার করতেন শুধু প্রত্যক্ষ ভাবে সেসবের সঙ্গে বিশেষ যুক্ত থাকেন নি । বিভিন্ন মহাদেশের বহুদেশে পর্যটনের ফলে তাঁর বিপুল বিদ্যাবত্তার সঙ্গে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মিলন ঘটে । " ৫৮

## অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২ - ১৯৫০)

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলায় রাম মোহন - বঙ্কিমের প্রভাব ছিল তীব্র । এই প্রভাবের চিন্তাধারায় অরবিন্দ লালিত পালিত হন । বঙ্কিম চন্দ্রের আদর্শ ছিল তাঁর দেশ প্রেমের উপজীব্য বস্তু । বিলাতে থাকাকালীন অবস্থাতে

রাজনীতির প্রতি তিনি আকৃষ্ট ছিলেন। দাদা ভাই নৌরজীর পার্লামেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁকেও উদ্বেলিত করেছিল। বিলাতেই তিনি ভারতীয় ছাত্রদের গুপ্ত সংস্থা 'Lotus and Dagger' এর সাথে যুক্ত ছিলেন।

দেশে ফিরে শুরু হলো ভারত ভক্তির সাধনা। বরোদায় থাকার সময় 'ইন্দু প্রকাশ' পত্রিকায় 'New Lamps for old' প্রবন্ধে দেশের রাজ-নৈতিক দুর্গতি সম্পর্কে লিখলেন। ধারণা পোষন করতেন বিপ্লব বাদের। সমগ্র বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলনের সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল প্রখর। স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাঁর স্ত্রীকে যে চিঠি লেখেন তাতে তাঁর মানসিক ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের। যাহা পরিবারের ভরণ পোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার, যাহা বাকি রহিল ভগবানকে ফেরৎ দেওয়া উচিৎ ..... ভগবানকে দেওয়ার মানে কি, মানে ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যয় করা। এই দুর্দিনে সমস্ত দেশ আমার আত্মীয়, আমার ত্রিশ কোটি ভাইবোন এদেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়। ..... আরেকস্থানে তিনি বলছেন, " অন্যলোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলো মাঠ ক্ষেত্র বন পর্ব্বত নদী বলিয়া জানে, আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি পূজা করি। মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয় তাহা হইলে ছেলে কি করে ? নিশ্চিত ভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী পুত্রের সাথে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায় ? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছিনা, জ্ঞানের বল। ক্ষাত্রতেজ আমার তেজ নহে, ব্রহ্মতেজ ও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।" ৫১

১৯০৫ এ ঘটল বঙ্গভঙ্গ । বঙ্গভঙ্গবিরোধী এই বিদ্রোহী বহ্নি শিখাকে দেখে তিনি সকল শক্তি নিয়ে এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়ালেন । কলকাতার রাজপথ তখন উদ্দীপ্ত । বাংলার প্রান্তরেদেশ প্রেমের আগুনের জোয়ার । অরবিন্দ কলকাতাকে বেছে নিলেন কাজের ক্ষেত্র রূপে । ১৯০৬ 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদনার ভার তুলে নিলেন । ইংরাজী রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন ।

তবুও বাংলা রচনার অনেক ফসলই অরবিন্দ দিয়েছেন । তিনি 'কর্মযোগিন' ও 'ধর্ম' নামে দুইটি পত্রিকা বার করেছিলেন । 'ধর্ম' প্রকাশিত হয় ১৩১৬ সালে । 'ধর্ম' পত্রিকায় আধ্যাত্মিকতা আর্যধর্মের অনুশীলন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধ রচিত হলেও অরবিন্দ স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে কিছু প্রবন্ধ ধর্ম' পত্রিকায় প্রকাশ করেন । বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত স্বদেশী যুগের প্রবন্ধ গুলো হচ্ছে গল্প 'স্বপ্ন' ( সুপ্রভাত পত্রিকায় প্রকাশিত , ১৩১৬ ) , 'ক্ষমার আদর্শ' ( ধর্ম , ১১ই ফাল্গুন , ১৩১৬ ) উপনিষদ ( ধর্ম , ২৭শে অগ্রহায়ণ , ১৩১৬ ) , 'পুরাণ' ( ধর্ম , ১২ই পৌষ , ১৩১৬ ) , 'গীতার ধর্ম্ম' ( ধর্ম , ১৪ই ভাদ্র , ১৩১৬ ) , সন্ন্যাস ও ত্যাগ' ( ধর্ম , ২১শে ভাদ্র , ১৩১৬ ) , 'বিশ্বরূপ দর্শন' ( ধর্ম , ২৫শে মাঘ , ১৩১৬ ) , গীতার ভূমিকা ( ধর্ম , ১৮ই আশ্বিন - ২রা ফাল্গুন , ১৩১৬ ) , 'অহঙ্কার' ( ধর্ম , ৪ঠা আশ্বিন , ১৩১৬ ) , 'স্তবস্তোত্র' ( ধর্ম , ২রা ফাল্গুন , ১৩১৬ ) , 'আমাদের ধর্ম্ম' ( ধর্ম , ৭ই ভাদ্র , ১৩১৬ ) , 'মায়া' ( ধর্ম , ২১শে ভাদ্র , ১৩১৬ ) , 'নিবৃত্তি' ( ধর্ম , ৬ অগ্রহায়ণ , ১৩১৬ ) , 'প্রাকাম্য' ( ধর্ম , ১২ , ১৯ পৌষ , ১৩১৬ ) , 'অতীতের সমস্যা' ( ধর্ম , ১১ই আশ্বিন , ১৩১৬ ) , 'দেশ ও জাতীয়তা' ( ধর্ম , ২৩শে অঘ্রান , ১৩১৬ ) , 'স্বাধীনতার অর্থ' ( ধর্ম , ২৩শে আশ্বিন , ১৩১৬ ) , 'ভাতৃত্ব ( ধর্ম , ২৩শে মাঘ , ১৩১৬ ) , 'জাতীয় উত্থান' ( ধর্ম , ৪ঠা আশ্বিন , ১৩১৬ ) , 'আমাদের আশা' ( ধর্ম , ৪ঠা আশ্বিন , ১৩১৬ ), প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' ( ধর্ম , ১৮ই মাঘ , ১৩১৬ ), এই সময় সুপ্রভাত পত্রিকায় 'কারা কাহিনী' ( ১৩১৬ ) প্রকাশিত হতে থাকে , এবং 'ভারতী'তে 'কারাগৃহ ও স্বাধীনতা' ।

অরবিন্দর সময় ভারতীয় পুরানো অতীত ও বর্তমান সমাজ মানসিকতায় পুরান্যে সবকিছুকে ভেঙে নতুন করে গড়বার যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল তাতে তাঁর প্রবন্ধ ' পুরাতন ও নূতন ' এ অরবিন্দ বলছেন " ..... বঙ্গদেশের যে এখনকার অবস্থা , তাহা হইতে কি অধিক সর্বনাশ , কি অধিক শোচনীয় পরিণাম হইতে পারে , তাহা বোঝা কল্পনা করা দুষ্কর । পুরাতন কে আঁকড়িয়া যদি এই অবস্থাই হইল , তবে নূতনের চেষ্টা করায় দোষ কি ? জাতির মৃত্যুর আশঙ্কা উপস্থিত , পুরাতনের উপর ভর দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা ভাল , না এই জাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা জীবনের মুক্তপথে বাহির হইবার প্রবৃত্তিই শ্রেয়স্কর ?

অরবিন্দ বিশ্লেষণী মন নিয়ে ভারতবর্ষের বর্তমান সঙ্কট জনক পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর ' অতীতের সমস্যা ' প্রবন্ধে । ইংরাজ অধীনস্থ ভারতের কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছেন তিনি । তিনি বলছেন , " অষ্টাদশ শতাব্দীতে তামসিক অজ্ঞান ও ঘোর রাজসিক প্রবৃত্তি ভারতবাসীকে গ্রাস করিয়াছিল , দেশে সহস্র স্বার্থপর , কর্তব্য পরাঙ্মুখ , দেশদ্রোহী , শক্তিমান অসুর প্রকৃতির লোক জন্ম গ্রহণ করিয়া পরাধীনতার অনুকূল অবস্থা প্রস্তুত করিয়া ছিল । সেই সময়ে ভগবানের গূঢ় অভিসন্ধি সম্পাদনার্থে ভারতে দূর দ্বীপান্তরবাসী ইংরেজ বণিকের আবির্ভাব হইয়াছিল । পাপ ভারাক্রান্ত ভারতবর্ষ অনায়াসে বিদেশীয় করতলগত হইল । "

অনেকে ইংরেজদের এই কার্যকে স্বদেশ প্রেমের কার্য বলে মনে করেন । অরবিন্দ কিন্তু তাঁর প্রবন্ধে ভিন্ন কথা বলছেন " ভারতবাসী তার সকল গুনে ইংরাজের সমান হইয়াও জাতীয় ভাব রহিত ছিলেন , ইংরাজের মধ্যে সেই গুনের পূর্ণ বিকাশ ছিল । এই কথায় যেন কেহ না বুঝেন যে ইংরাজগণ স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন । .... ইংরাজ - গণ স্বদেশের হিতার্থে ভারতে আসেন নাই , নিজ নিজ অধিক লাভার্থে আসিয়াছিলেন , স্বদেশর হিতার্থে ভারত বিজয় ও লুণ্ঠন করেন নাই । অনেকটা নিজ স্বার্থ সিদ্ধার্থে জয় ও লুণ্ঠন করিয়াছিলেন । "

ভারতের ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিবেশ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন ভারত পূর্ণ তমো - ভাবের কোড়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, অজ্ঞান, অকর্মণ্যতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, আত্ম সম্মান বিসর্জন, দাসত্ব প্রিয়তা, পরধর্ম সেবা, পরের অনুকরণ, পরাশ্রয়ে আত্মোন্নতি চেষ্টা বিষাদে আত্ম নিন্দা, ক্ষুদ্রাশয়তা, আলস্য ইত্যাদি সকলই তমোভাব প্রকাশক গুণ। এই সকলের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতে কোনটির অভাব ছিল ? সেই শতাব্দীর সর্বচেষ্টা ও গুণ সকলের প্রবলো তম:শক্তির চিহ্নে সর্বত্রই চিহ্নিত।"

এখন এই স্বদেশী যুগে ভারত জাগ্রত। " সেই জাগরণের প্রথম আবেগে জাতীয় ভাবের উদ্দীপনার জ্বালাময়ী শক্তি জাতির শিরায় শিরায় খরতর বেগে বাহিতে লাগিল। তাহার সহিত স্বদেশ প্রেমের উন্মাদকর আবেগ যুবকবৃন্দকে অভিভূত করিল। আমরা পাশ্চাত্য জাতি নহি, আমরা এশিয়াবাসী, আমরা ভারতবাসী, আমরা আর্য্য। আমরা জাতীয় ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু তাহার মধ্যে স্বদেশ প্রেমের সঞ্চার না হইলে আমাদের জাতীয় ভাব পরিস্ফুট হয় না। এই স্বদেশ প্রেমের ভিত্তি মাতৃ - পূজা। যেদিন বঙ্কিম চন্দ্রের ' বন্দেমাতরম ' গান বাহ্যেন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া প্রাণে আঘাত করিল, সেই দিন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্বদেশ প্রেম জাগিল, মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বদেশ মাতা, স্বদেশ ভগবান স্বরূপ। যেমন জীব ভগবানের অংশ, তাহার শক্তি ভগবানের শক্তির অংশ, তেমনই এই সপ্তকোটি বঙ্গ - বাসী, এই ত্রিংশকোটি ভারতবাসীর সমষ্টি সর্বব্যাপী বাসুদেবের অংশ, এই ত্রিংশ - কোটির আশ্রয় শক্তি স্বরূপিণী, বহুভুজান্বিতা, বহুবলধারিণী ভারত জননী ভগবানের একটি শক্তি, মাতা, দেবী জগজ্জননী কালীর দেহ বিশেষ। এই মাতৃ - প্রেম মাতৃজাতির মনে প্রাণে জাগরিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই কয় বর্ষের উত্তেজনা, উদ্যম, কোলাহল, অপমান, লাঞ্ছনা, নির্যাতন ভগবানের বিধানে বিহিত ছিল।"

স্বদেশী আন্দোলন যুগের যুব সমাজের মধ্যে জীবন বলিদান করার মহৎ আদর্শ অরবিন্দ দেখেছিলেন, যে মহৎ শক্তির অভ্যুদয় দেখেছিলেন সেই শক্তিকে

তিনি সংহত করতে চাইছিলেন। তাই এই প্রবন্ধের শেষভাগে বলছেন, " এখন যে সব যুবক বৃন্দ দেশময় পথান্বেষণ ও কর্ম্মান্বেষণ করিতেছেন, তাহারা উত্তেজনা অতিক্রম করিয়া ছিন্নদিন শক্তি অনয়নের পথ খুঁজিয়া লউন। যে মহৎ কার্য্য সমাধা করিতে হইবে তাহা কেবল উত্তেজনার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, শক্তি চাই। তোমাদিগের পূর্ব পুরুষদের শিরায় যে শক্তি প্রবাহিত হওয়া যায় সেই শক্তি ঘটন ঘটিয়সী। সেই শক্তি তোমাদের শরীরে অবতরণ করিতে উদ্যত হইতেছেন। সেই শক্তিই মা। তাহাকে আত্ম সমর্পণ করিবার উপায় শিখিয়া লও। মা তোমাদিগকে যন্ত্র করিয়া বৃহৎ সত্বর এমন সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন যে জগৎ স্তম্ভিত হইবে। সেই শক্তির অভাবে তোমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইবে। মাতৃমূর্ত্তি তোমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, তোমরা মাতৃপূজা ও মাতৃ সেবা করিতে শিখিয়াছ, এখন অন্তর্নিহিত মাতাকে আত্ম সমর্পণ কর। কার্যোদ্ধারের অন্য পন্থা নাই। " ৬০

বঙ্কিমের যুগে রাজনৈতিক সংজ্ঞা ও রাজনৈতিক ধারণার সংঘাত ছিল। দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, নরমপন্থী মতবাদের আদর্শ, চরমপন্থীর দৃষ্টিকোন এই সকল বিষয় নিয়ে মানুষের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। অরবিন্দ ' দেশ ও জাতীয়তা ' প্রবন্ধে কিছু ধ্যান ধারণার ব্যাখ্যা করলেন। " যখন এক দেশ এক মা – একদিন একতা হইবেই হইবে, অনেক জাতির মিলনে এক বলবান অজেয় জাতিই হইবে, ধর্ম্মমত এক নহে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে চির বিরোধ, মিল নাই, মিলের আশাও নাই, তথাপি ভয় নাই, একদিন স্বদেশ মূর্ত্তি ধারিণী মায়ের প্রবল টানে ছলে বলে, সাম্য দণ্ড মিল হইবেই হইবে, সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা তাতৃভাবে, মাতৃ প্রেমে ডুবিয়া যাইবে। এক দেশে নানা ভাষা, ভাই ভাইয়ের কথা বুঝিতে অক্ষম, পরস্পরের ভাবে প্রকাশ করিতে না, হৃদয়ে হৃদয়ে আবদ্ধ হইবার পথে অভেদ্য প্রাচীর পড়িয়া রহিয়াছে, অতি কষ্টে লঙ্ঘন করিতে হয়, তথাপি ভয় নাই। এক দেশ, এক জীবন, এক চিন্তার স্রোত সকলের মনে, প্রয়োজনের প্রেরণায় সাধারণ ভাষা সৃষ্ট হইবেই হইবে, হয় বর্ত্তমান একটি ভাষার আধিপত্য স্বীকৃত হইবে, নহে ত নতুন ভাষার সৃষ্টি হইবে, মায়ের

মন্দিরে সকলে সেই ভাষা ব্যবহার করিবে । ..... এক মায়ের গর্ভে জন্ম হইয়াছে , এক মায়ের কোলে নিবাস করি , এক মায়ের পঞ্চভূতে মিশিয়া যাই , আন্তরিক সহস্র বিবাদ সত্ত্বেও মায়ের ডাকে মিলিতে হইব । প্রাকৃতিক নিয়ম এই , সর্বদেশের ইতিহাসের শিক্ষা এই , দেশ জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা , সেই সম্বন্ধ অবশ্য , স্বদেশ থাকিলে জাতীয়তা অবশ্যম্ভাবী । এক দেশে দুই জাতি চিরকাল থাকিতে পারে না , মিলিত হইবেই । এপক্ষে একদেশ যদি না থাকে , জাতি ধর্ম্ম , ভাষা এক হউক , তাহাতে কোনও ফল নাই , একদিন স্বতন্ত্র জাতির সৃষ্টি হইবেই । স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশ সংযুক্ত করিয়া এক বৃহৎ সাম্রাজ্য করা যায় , এক বৃহৎ জাতি হয় না । সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে আবার স্বতন্ত্র জাতি হয় , অনেকবার সেই অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক স্বতন্ত্রতাই সাম্রাজ্য নাশের কারণ হয় । "

তদানীন্তন ভারতের পরিবেশ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অরবিন্দ বলছেন , " আমাদের দেশে কখনও একতা হয় নাই , কিন্তু চিরকাল একতার দিকে টান ছিল , স্রোত ছিল , আমাদের ইতিহাসে ভারতের বিভিন্ন অংশ এক করিবার জন্য আকর্ষন করিয়াছে । এক প্রাকৃতিক চেষ্টার কয়েকটি প্রধান অন্তরায় ছিল , প্রথম প্রাদেশিক বিভিন্নতা , দ্বিতীয় হিন্দু - মুসলমান বিরোধ , তৃতীয় মাতৃ দর্শনের অভাব । দেশের বৃহৎ আকার , যাতায়াতের আয়াস ও বিলম্ব , ভাষার বিভিন্নতা প্রাদেশিক অনৈক্যের মুখ্য সহায় । "

আমাদের দৃষ্টি যে সম্পূর্ণ দেশ গঠনের ছিল না তিনি উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করছেন , " আমাদের রাজনীতিবিদ প্রায়ই মায়ের সম্পূর্ণ স্বরূপ দর্শন করিতে অসমর্থ ছিলেন । রণজিৎ সিংহ বা গুরু গোবিন্দ ভারত মাতা না দেখিয়া পঞ্চনদ মাতা দেখিয়েছিলেন । শিবাজী ও ও বাজীরাও ভারতমাতা না দেখিয়া হিন্দুর মাতা দেখিয়াছিলেন । অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় রাজনীতিবিদ মহারাষ্ট্র মাতা দেখিয়াছিলেন । আমরাও বঙ্গভঙ্গের সময়ে বঙ্গ মাতার দর্শন লাভ করিয়াছিলাম । সেই দর্শন অখন্ড দর্শন অতএব বঙ্গদেশের ভাবী একতা ও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী , কিন্তু ভারত মাতার

অখন্ড মূর্ত্তি এখনও প্রকাশ হয় নাই। কংগ্রেসে যে ভারত মাতার পূজা নানারূপ স্তব স্তোত্র করিতাম, সে কল্পিত, ইংরেজ সহচরী ও প্রিয় দাসী, ম্লেচ্ছ বেশভূষা সজ্জিত দানবী মায়া, সে আমাদের মা নহে, তাহার পশ্চাতে প্রকৃত মা নিবিড় প্রস্ফুট আলোকে লুক্কায়িত আমাদের মন প্রাণ আকর্ষণ করিতেন। যেদিন অখন্ড স্বরূপ পূর্ণ মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিব, তাঁহার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য উন্মত্ত হইব, সেদিন এ অন্তরায় তিরোহিত হইবে, ভারতের একতা স্বাধীনতা ও উন্নতি সহজ সাধ্য হইবে।" ৬১

পরাধীন দেশের একটি মাত্রই উদ্দেশ্য থাকে তার নাম স্বাধীনতা। স্বাধীনতা সম্পর্কেও বিচিত্র ধারণা বিভিন্ন ব্যক্তি পোষণ করতেন। অরবিন্দ 'স্বাধীনতা' প্রবন্ধে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করছেন " জাতির পক্ষে পরাধীনতা মৃত্যুর দূত ও আজ্ঞা-বাহক, স্বাধীনতাই জীবন রক্ষা, স্বাধীনতাই উন্নতির সম্ভাবনা। ..... পরাধীনতা প্রধান ভিত্তি জাতির স্বধর্মনাশ ও পরধর্মসেবা। যদি পরাধীন অবস্থায় স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে বা পুনরুজ্জীবিত করিতে পারি, পরাধীনতার বন্ধন আপনি খসিয়া পড়িবে, ইহা অলঙ্ঘনীয় প্রকৃতির নিয়ম। অতএব কোন জাতি যদি নিজদোষে পরাধীনতায় পতিত হয়, অবিকল ও পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ তাহার প্রথম উদ্দেশ্য ও রাজনীতিক আদর্শ হওয়া উচিৎ। ..... আমরা পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ চাই। যদি বৃটিশ জাতি এমন যুক্ত সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা করে যে, তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া ভারতবাসীর সেইরূপ স্বরাজ সম্ভব হয় আপত্তি কি? আমরা ইংরেজ জাতির বিদ্বেষে স্বরাজ চেষ্টা করিতেছি না, দেশ রক্ষার জন্য করিতেছি। কিন্তু আমরা পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ ভিন্ন অন্য আদর্শ স্বীকার করিয়া দেশবাসীকে মিথ্যা রাজনীতি ও দেশ রক্ষার ভুল মার্গ প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত নহি।" ৬২

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন দেশে এক উদ্দীপনের সৃষ্টি করেছিল। বাস্তবিক পক্ষে এটা ছিল জাতীয় উদ্দীপন। অরবিন্দও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে জাতীয় উদ্দীপন বলে মনে করতেন। তাই তিনি 'জাতীয় উদ্দীপন' নামকশীর্ষে এই আন্দোলনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলছেন " আমাদের প্রতিপক্ষীয় ইংরেজগণ বর্ত্তমান মহৎ ও সর্ব্বব্যাপী

আন্দোলনকে আরম্ভাবধি বিদ্বেষজাত বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিতেছেন এবং তাহাদের অনুকরণ প্রিয় কয়েকজন ভারতবাসীও এই মতের পুনরাবৃত্তি করিতে ত্রুটি করেন না, আমরা ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত জাতীয় উত্থান স্বরূপ আন্দোলন ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া কখন প্রচার করিতে সাহসী হইতাম না। বিরোধ যুদ্ধ হত্যা পর্যন্ত ধর্মের অঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু বিদ্বেষ ও ঘৃণা ধর্মের বহির্ভূত, বিদ্বেষ ও ঘৃণা জগতের একোন্নতির বিকাশে বর্জনীয় হয়, অতএব যাহারা স্বয়ং এই বৃত্তিগুলি পোষণ করেন কিম্বা জাতির মধ্যে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করেন তাহারা অজ্ঞানের মোহে পতিত হইয়া পাপকে আশ্রয় দেন। এই আন্দোলনের মধ্যে কখনও যে বিদ্বেষ প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যখন এক পক্ষ বিদ্বেষ ও ঘৃণা করে, তখন অপর পক্ষেও তাহার প্রতিঘাত স্বরূপ বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রসূত হওয়া অনিবার্য্য। এই রূপ পাপ সৃষ্টির জন্য বঙ্গদেশের কয়েকটি ইংরাজ সংবাদ পত্র ও ঔদ্ধত স্বভাব অত্যাচারী ব্যক্তি বিশেষের আচরণ দায়ী। ..... ভারতবাসীর প্রাণে বহুকাল হইতে ইংরাজ ব্যক্তি বিশেষের অন্যায় আচরণে ও ঔদ্ধত কথায় এবং বর্তমান শাসন তন্ত্রে প্রজার কোনও প্রকৃত অধিকার বা ক্ষমতা না থাকায় ভিতরে ভিতরে অসন্তোষ অলক্ষিত ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল। শেষে লর্ড কার্জনের শাসন সময়ে এই অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করিয়া বঙ্গভঙ্গ জাত অসহ্য মর্ম্মবেদনার অসাধারণ ক্রোধ দেশময় জ্বলিয়া উঠিয়া রাজপুরুষদিগের নিগ্রহ নীতির বলে বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছিল। .... কোন ব্যক্তি বিশেষ, তিনি রাজ পুরুষই হউন বা দেশবাসীই হউন অমঙ্গল, অন্যায় বা অযৌক্তিক কার্য বা মত প্রকাশ করিলে আমরা শুদ্ধ সমাজোচিত আচারের অধিকারী বিদ্রূপ ও তিরস্কার করিয়া সেই কার্য্য বা সেই মতের প্রতিবাদ ও খণ্ডনে অধিকারী। কিন্তু কোনও জাতি বা ব্যক্তির উপর বিদ্বেষ বা ঘৃণা পোষণ বা সৃজনে আমরা অধিকারী নহি। অতীতে যদি এইরূপ দোষ ঘটিয়া থাকে, সে অতীতের কথা ভবিষ্যতে যাহাতে এই দোষ না ঘটে আমরা সকলকে এবং বিশেষতঃ জাতীয় পক্ষের সংবাদ পত্র ও কার্যক্ষম যুবকবৃন্দকে এই উপদেশ দিতেছি। ..... আমরা ভবিষ্যত আশা স্বরূপ যুবকদিগকে বলি, যদি তোমাদের প্রাণে বিদ্বেষ থাকে, তাহা অচিরেই উন্মূলিত কর। বিদ্বেষের তীব্র উত্তেজনায় ক্ষণিক বলপূর্ণ বল সহজে জাগ্রত হয় ও শীঘ্র অধিকার দুর্বলতায় পরিণত হয়। যাহারা দেশোদ্ধারার্থে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও

উৎসর্গীকৃত প্রাণ , তাঁহাদের মধ্যে প্রবল ভাতৃভাব , কঠোর উদ্যম , লৌহসম দৃঢ়তা ও জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তেজ সঞ্চার কর , সেই শক্তিতে এটুট বলান্বিত ও চিরজয়ী হইব । "

অন্ধকার দীর্ণ ভারতে অরবিন্দ বঙ্গভঙ্গ যুগে আশার আলোকে যুব সমাজকে উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করেছেন তাঁর ' আমাদের আশা ' প্রবন্ধে । তিনি বলছেন , " আমাদের বাহুবল নাই , যুদ্ধের উপকরণ নাই , শিক্ষা নাই , রাজশক্তি নাই , আমাদের কিসেতে আশা , কোথায় সেই বল যাহার ভরসায় আমরা প্রবল শিক্ষিত য়ুরোপীয় জাতির অসাধ্য সাধন করিতে প্রয়াসী হই । ..... যতো ধর্ম্ম ততো জয়: , কিন্তু ধর্ম্মের পিছনে শক্তি চাই , নতেৎ অধর্ম্মের অভ্যুত্থান , ধর্ম্মের গ্লানি স্থায়ী থাকিবার কথা । বিনা কারণে কার্য্য হয় না । জয়ের কারণ শক্তি । "

" ..... কয়েক বৎসরের নিপীড়ন দুর্ব্বলতা ও পরাজয়ের ফলে ভারতবাসী নিজের মধ্যে শক্তির উৎস অন্বেষণ করিতে শিখিয়াছে । বক্তৃতার উত্তেজনা নহে , ম্লেচ্ছ দত্ত বিদ্যা নহে , সভা সমিতির ভাব সঞ্চারিণী শক্তি নহে , সংবাদ পত্রের ক্ষণস্থায়ী প্রেরণা নহে , নিজের মধ্যে আত্মার বিশাল নীরবতায় ভগবান ও জীবের সংযোগে যে গভীর অবিচলিত ভ্রান্ত বুদ্ধ দু:খ জয়ী পাপ পুন্য বর্জিত শক্তি সম্ভূত হয় , সেই মহাসৃষ্টি কারিণী , মহা প্রলয়কারী , মহাস্থিতি পালিনী , জ্ঞান - দায়িণী মহা সরস্বতী ঐশ্বর্য্য দায়িণী মহালক্ষ্মী , শক্তিদায়িনী মহাকালী , সেই তেজের সংযোজনে একীভূতা চন্ডী প্রকট হইয়া ভারতের কল্যাণে ও জগতের কল্যাণে কৃতোদ্যম হইবে । ভারতের স্বাধীনতা গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র , মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতের সভ্যতার শক্তি প্রদর্শন এবং জগৎময় সেই সভ্যতার বিস্তার ও অধিকার । আমরা যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে সভা সমিতির বলে বক্তৃতার জোরে বাহুবল স্বাধীনতা বা স্বায়ত্ব শাসন উদায় করিতে পারিতাম , সেই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হইত না । ভারতীয় সভ্যতার বলে , আধ্যাত্মিক শক্তিতে , আধ্যাত্মিক শক্তির সৃষ্ট সূক্ষ্ম ও স্থূল উপায়ে স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে । ..... ত্রিলোক পাবনী গঙ্গা ভারত প্লাবিত করিয়া , পৃথিবী প্লাবিত করিয়া অমৃত স্পর্শে জগতের নূতন যৌবন আনয়ন করিবে । " ৬২

বিদেশের ভাবনা তদানীন্তন সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। স্বদেশী যুগে চিন্তা-ধারার মধ্যেও বিবর্তন ঘটে। আপন দেশের ভাবনার মধ্যে নিজেকে বড় করার প্রবনতা আসে। আসে বিদেশী চিন্তাধারার ক্ষেত্রে নিজস্ব সাংস্কৃতিক চিন্তা ধারাকে প্রতিষ্ঠা করার মনোভাব। অরবিন্দ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'তে সেই ভাবনা সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলছেন, " আমাদের দেশে ও য়ুরোপে মুখ্য প্রভেদ এই যে আমাদের জীবন অন্তর্মুখী, য়ুরোপের জীবন বহির্মুখী। আমরা ভাবকে আশ্রয় করিয়া পাপ পুন্য ইত্যাদি বিচার করি। য়ুরোপ কর্মকে আশ্রয় করিয়া পাপ পুন্য ইত্যাদি বিচার করে। আমরা ভগবানকে অন্তর্যামী ও আত্মস্থ বুঝিয়া অন্তরে তাঁহাকে অন্বেষণ করি, য়ুরোপে ভগবানকে জগতের রাজা বুঝিয়া বাহিরে তাঁহাকে দেখে ও উপাসনা করে। ..... আমাদের শিব পরমেশ্বর অথচ ভিক্ষুক, পাগল ভোলানাথ, আমাদের কৃষ্ণ বালক, হাস্যপ্রিয় রসময়, প্রেমময়, ক্রীড়া করা তাঁহার ধর্ম। য়ুরোপের ভগবান কখন হাসে না, ক্রীড়া করেন না, তাঁহাতে তাঁহার গৌরব নষ্ট হয়, তাঁহার ঈশ্বরত্ব আর থাকে না।

" ..... য়ুরোপীয় পন্ডিতগণ বলেন ভারতে প্রজাতন্ত্র কোন যুগে ছিল না। প্রজাতন্ত্র সূচক কোনও কথা সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় না, আধুনিক পার্লিয়ামেন্টের ন্যায় কোন আইন ব্যবস্থাপক সভাও ছিল না, প্রজাতন্ত্রের বাহ্য চিহ্নের অভাবে প্রজাতন্ত্রের অভাব প্রতিপন্ন হয়। আমরাও এই পাশ্চাত্য যুক্তি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। আমাদের প্রাচীন আর্যরাজ্যে প্রজাতন্ত্রের অভাব ছিল না, প্রজা-তন্ত্রের বাহ্যিক উপকরণ অসম্পূর্ণ ছিল বটে, কিন্তু প্রজাতন্ত্রের ভাব আমাদের সমস্ত সমাজ ও শাসন তন্ত্রের অন্তরে বাস্ত হইয়া প্রজার সুখ ও দেশের উন্নতি রক্ষা করিত। প্রথমতঃ প্রত্যেক গ্রামে সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্র ছিল, গ্রামের লোক সম্মিলিত হইয়া সর্ব সাধারণের পরামর্শে বৃদ্ধ ও নেতৃ স্থানীয় পুরুষদের অধীনে গ্রামের ব্যবস্থা, সমাজের ব্যবস্থা করিতেন, এই গ্রাম্য প্রজাতন্ত্র মুসলমানদের আমলে অক্ষুন্ন রহিল, বৃটিশ শাসনতন্ত্রের নিষ্পেষণে সেই দিন নষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যেও যেখানে সর্ব সাধারণকে সম্মিলিত করিবার সুবিধা ছিল, সেই রূপ প্রথা

বিদ্যমান ছিল , বৌদ্ধ সাহিত্যে , গ্রীক ইতিহাসে , মহাভারতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় । বর্তমান প্রজাতন্ত্রের স্বরূপ দেখে তিনি বলছেন , " আজকাল প্রাচ্য দেশে প্রজাতন্ত্রের ভাব ও শ্রদ্ধা প্রবল বেগে পরিস্ফুট হইয়া বাহ্য উপকরণ সৃজন করিতেছে , বাহ্য আকার গঠন করিতেছে , কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে সেই ভাব ম্লান হইতেছে , সেই শ্রদ্ধা ক্ষীণ হইতেছে । প্রাচ্য প্রভাতোন্মুখ , আলোর দিকে ধাবিত পাশ্চাত্য তিমিরগামী রাত্রির দিকে ফিরিয়া যাইতেছে । " ৬৩

স্বদেশী যুগে বিদেশী মোহ সম্পর্কে সাবধান বানী উচ্চারণ করে তিনি বলছেন " কয়েকদিন রাজসিক তেজে তেজস্বী হইয়া অসুর মহান শ্রী সম্পন্ন , অজেয় হয় , তাহার পরে অন্তর্নিহিত দোষ বাহির হয় , সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হয় । ভাব ও শ্রদ্ধা সজ্ঞান ও কর্ম , অনাসক্ত কর্ম যে দেশে শিক্ষার মূলমন্ত্র সেই দেশই অন্তর ও বাহির , প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একীকরণে সমাজ , অর্থনীতি , রাজনীতির সকল সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা কার্য্যতঃ হইতে পারে । কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান ও শিক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া সেই মীমাংসা করিতে পারিব না । প্রাচ্যের উপর দন্ডায়মান হইয়া সেই পাশ্চাত্যকে আয়ত্ত করিতে হইবে । অন্তরে প্রতিষ্ঠা , বাহিরে প্রকাশ । ভাবের পাশ্চাত্য উপকরণ অবলম্বন করিলে বিপদগ্রস্ত হইব , নিজ স্বভাব ও প্রাচ্য বুদ্ধির উপযুক্ত উপকরণ সৃজন করিতে হইবে । " ৬৪

অরবিন্দের তেজস্বী ভাষা প্রকাশিত হতো ' বন্দেমাতরম ' পত্রিকায় । স্বদেশী যুগে ' বন্দেমাতরমে ' র জ্বালাময়ী পৃষ্ঠাগুলো হতে জন্ম নিয়েছিল জাতীয়তাবাদের অগ্নিবন্যা । এই প্রভাবের সাথে অরবিন্দের বাংলা রচনাও জনমানসে বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল ।

'The new movement is not primarily a protest against bad government-it is a protest against the continuance of British Control,whether that control is used well or ill,justly or unjustly, is a minor and unessential consideration. It is not born of a disappointed expectation of of admission to British cátizenship, - it is born of conviction that the time

has come when India can, should and will become a great, free and united nation. It is not a negative current of destruction, but a positive constructive impulse towards the making of modern India. It is not a cry of revolt and despain, but a gospel of national faith and hope".

১৯০৭ এর ২৬শে এপ্রিল 'বন্দেমাতরম' এর সংখ্যায় অরবিন্দ লিখেছিলেন একথা। সারা দেশ জাগ্রত হয়েছিল সেই ভাবনায়। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জাতি খুঁজেছিল মুক্তির পথ। পাথেয় ছিল অরবিন্দের ভাবনা ও রচনা।

## রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪ - ১৯১৯)

বঙ্গভঙ্গ যুগে স্বাদেশিকতার ভাবনাকে যাঁরা প্রচার করার মহতী দায়িত্ব নিয়েছিলেন রামেন্দ্র সুন্দর তাঁদেরই একজন। ১৯০৫ এর ১৬ই অক্টোবর (১৩১২ এর ৩০শে আশ্বিন ) রাখীবন্ধন ও অরন্ধন পালিত হয়। অরন্ধনের প্রস্তাব ছিল রামেন্দ্র সুন্দরের। " তিনি অরন্ধনের পরিকল্পনা করিয়া তাহা সামাজিক ব্রত অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সমাজের অর্ধাঙ্গ ভগিনী স্ত্রী জাতিকে সেই আন্দোলনের পশ্চাতে রাখিয়া পুরুষ জাতিকে শক্তি ও উৎসাহ বর্ধন করিবার অভিপ্রায় তিনি শক্তিরূপিণী স্ত্রী জাতির জন্য অপূর্ব ভাষায় ' বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা ' রচনা করিয়াছিলেন। " ৬৫

' বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা ' (১৩১২) এর বঙ্গদর্শনের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

পরে এটি আলাদা ভাবে পুস্তিকারূপে মুদ্রিত হয়। বঙ্গভঙ্গের দিন অর্থাৎ ৩০শে আশ্বিন পল্লীগ্রামে প্রায়ই ৫০০ জন মহিলার সমাবেশে এই ব্রত উযাপিত হয় ও পঠিত হয়।

রামেন্দ্র সুন্দর তাঁর ব্রতকথার ভূমিকায় লিখলেন, " বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের দিন অপরাহ্নে জেমো কান্দি গ্রামের অর্ধ সহস্রাধিক পুরনারী আমার মাতৃদেবীর আহ্বানে আমাদের বাড়ীর বিষ্ণু মন্দিরের উঠোনে সমবেত হইয়া ছিল, গুহ্যেও অনুষ্ঠানের পর আমাদের কন্যা শ্রীমতী গিরিজা কর্তৃক এই ব্রতকথা পঠিত হয়।

## ব্রতকথা

১৩১২ সাল। আশ্বিন মাসের তিরিশে, সোমবার কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, সেদিন বড় দুর্দিন। সেইদিন রাজার হুকুমে বাঙালী দুভাগ হবে, দুভাগ দেশে বাঙলার লক্ষ্মী বাংলা ছেড়ে যাবেন। পাঁচ কোটি বাঙালী আছাড় খেয়ে গড়াগড়ি দিয়ে ডাকতে লাগল — মা, তুমি বাঙলার লক্ষ্মী, তুমি বাংলা ছেড়ে যেয়ো না, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, বিদেশী রাজা আমাদের সুখ দুঃখ বোঝেন না। ভাই ভাই - ভাই ঠাঁই ঠাঁই করতে চাইলেন, আমরা ভাই - ভাই ঠাঁই ঠাঁই হব না, মা তুমি কৃপা কর, আমরা এখন থেকে মানুষের মতো হব।

## ব্রতের অনুষ্ঠান

প্রতি বৎসর আশ্বিনে বঙ্গ বিভাগের দিনে বঙ্গের গৃহিনীগণ বঙ্গ লক্ষ্মীর ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। সেদিন অরন্ধন। দেশ সেবা ও রোগীর ও শিশুর সেবা ব্যতীত সেদিন অন্য উদ্দেশ্যে গৃহে উনুন জ্বলিবে না। ফলমূল চিড়া মুড়ি অথবা পূর্ব দিনের রাঁধা ভোজন চলিবে।

পরিবারস্থ নারীগণ যথারীতি ঘট স্থাপন করিয়া ঘটের পার্শ্বে উপবেশন করিবেন। বিধবারা ললাটে চন্দন ও সধবারা সিন্দুর লইবেন। হরিতকী বা সুপারী হাতে লইয়া বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনিবেন। কথা শেষে বালকেরা শঙ্খ ধ্বনি করিলে পর ঘটে প্রণাম করিবেন। প্রণামান্তে বামহস্তের ( বালকেরা দক্ষিণ হস্তের ) প্রকোষ্ঠে স্বদেশী বা রেশমের হরিদ্রা রঞ্জিত সূত্রে পরস্পর রাখী বাঁধিয়া দিবেন। রাখী বন্ধনের সময় শঙ্খ ধ্বনি হইবে। তৎপর পাটালী প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। সংবৎসর কাল যথাযোগ্য বিদেশী, বিশেষত বিলাতী দ্রব্য বর্জন করিবেন। সাধ্য পক্ষে প্রতিদিন গৃহ কর্ম আরম্ভের পূর্বে লক্ষ্মীর ঘটে মুষ্টি ভিক্ষা রাখিবেন। এবৎসরান্তে বা বৎসরান্তে উহা কোনরূপ মায়ের কাজে বিনিয়োগ করিবেন।"

বাঙ্গার উদ্দীপ্ত পরিবেশে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' যেন স্তিমিত জ্যোৎস্নায় প্রদীপ শিখার আলোকের পবিত্র শঙ্খের সুরে সুরে বাঙ্গার গ্রাম গ্রামান্তর দেশ প্রেমের ধর্ম ভাবনায় মোহিত হয়ে গেল। এক সাহিত্যিকার বললেন "রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর সে এক অনবদ্য রচনা। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাষা। কিন্তু প্রতিটি অক্ষরে যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে দেশের মাটির গন্ধ। দেশের আকাশের আলো, দেশের মানুষের সুদৃঢ় চেতনা। ঘরের কোনে প্রদীপ জ্বেলে মা বাবা ভাই বোন, পুত্র কন্যা সবাই মিলে একসঙ্গে বসেছে গোল হয়ে। নতুন যুগের যজ্ঞ যেন পড়ছে একজন শুনছে সবাই। শুনতে শুনতে নিমেষে যেন রক্তের মধ্যে গিয়ে স্পন্দন জাগছে স্বদেশীয়ানার অভিনব মন্ত্রধ্বনি।" ৬৬

## ব্রতকথা শুরু

"বন্দেমাতরম। বাঙ্গা নামে দেশ। তার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা স্বর্গে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ, কাশী পার হয়ে মা, পূর্ব বাহিনী হয়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে মা শতমুখী হলেন।

শতমুখী হয়ে সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে শত মুখে অধিষ্ঠান করলেন। বাংলার লক্ষ্মী বাংলা দেশ জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ ভরো হল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল তাতে রাজ-হংস খেলা করতে লাগল। লোকের গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু। গাল ভরা হাসি। লোকে পরম সুখে বাস করতে লাগল।"

কিন্তু সেই সুখ স্থায়ী হলো না। ইংরেজ সওদাগর দেশ লুঠ করল। গ্রাস করতে চাইল দেশের ব্যবসা বাণিজ্য। দিল্লী বাদশাকে টানতে চাইল নিজের বশে।

"বাংলার ধন দেখে ধান দেখে তাদের লোভ হল। লক্ষ্মী তখন আলমগীরের বংশের দিল্লীর বাদশাকে ছেড়েছেন। বাদশা ইংরেজকে বাংলার দেওয়ান করে দিলেন। বাদশার দশা দেখে বাদশাকে খাজানা দেওয়া বন্ধ করে তারাই হল বাংলার রাজা। তারা এসেছিল সদাগর, হয়েছিল বাদশার দেওয়ান, হয়ে গেল দেশের রাজা। রাজা হলো কিন্তু রাজ্যে বাস করল না, বাঙলা দেশের ধন নিয়ে ধান নিয়ে সাত সমুদ্র পারে আপন দেশে চলল। সদাগরের জাত কিনা মেজাজ ঠাণ্ডা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অতিশয় ধূর্ত। তারা চোর ডাকাত দমন করল, মিষ্টি মিষ্টি কথা কইতে লাগল, আবার নিজের দেশ থেকে খেলনা এনে পুতুল এনে প্রজার মন ভোলাতে লাগল। .... ইংরেজ রাজার এক চোকরা নায়েব ছিল। সে আপন দেশে ছিল কেরাণী, এসে হয়েছিল নায়েব। নায়েবী পেয়ে সে ধরা কে সরা জ্ঞান করত। আলমগীর বাদশার তক্তে বসে সে আপনাকে আলমগীরের নাতি ঠাওরাত। সে বললে, এরা বড় ঘ্যান ঘ্যান করছে, যাক এদের দুদল করে দিচ্ছি, একদিকে থাক মোছলমান একদিকে থাক হিন্দু। — এই বলে তিনি বাঙালীকে দুদল করে দিলেন।"

"তারপর এল মহা দুর্দিন। ষড়যন্ত্রের কথা শুনে কেঁপে উঠল সারা বাংলা। লক্ষ্মীর পায়ে আছড়ে পড়ল সারা দেশ। প্রতিজ্ঞা করলে — আমরা ভাই ভাই ঠাঁই

ঠাঁই হব না। আমরা এক। আমরা এক আকাশের নীচে, এক ধানের খেতে, এক নদীর জলে, এক গাছের ছায়ায় বুকে বুক মিলিয়ে বাস করবো চিরদিন।" ৬৬

" তিরিশে আশ্বিন, কোজাগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া। পূর্ণিমার পূজা নিয়ে বাঙলার লক্ষ্মী ঐ দিন বাঙলা ছাড়ছিলেন। ঐদিন বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় অচলা হল। বাঙলার হাটে মাঠে ঘাটে জুড়ে বসলেন। — বাঙলার মেয়েরা ঐদিন বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত নিলে ঘরে ঘরে সেদিন উনুন জ্বলল না। হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই বেলা কুলি করলে। হাতে হাতে হলুদ সুতোর রাখী বাঁধলে। ঘট পেতে লক্ষ্মীর ব্রতকথা শুনলে। যে এই লক্ষ্মীর ব্রত কথা শোনে তার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হন।"

এর পর নেওয়া হল শপথ বানী। ব্রতকথার সাথে সমগ্র দেশ পবিত্রতার শপথ বানী উচ্চারণ করলো। " মা লক্ষ্মী কৃপা কর, কাফন দিয়ে কাচ নেবো না। ঘরের থাকতে পরের নেবো না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না। মোটা অন্ন ভোজন করবো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ করবো। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। মোটা অন্ন অমৃত হোক। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুক, বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাকুক।" ৬৭

বঙ্গভঙ্গ রুদ্ধে বাঙলার মেয়েদের মানসিকতা ধীরে ধীরে জাগছিল অন্যায় ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে। পুরুষদের পাশে এসে স্বাধীনতার আকাঙ্খায় তাদেরও মন সাড়া দিচ্ছিল অজানার আহ্বানে। ' বঙ্গ লক্ষ্মীর ব্রতকথা ' সেই সুপ্ত অভিমানকে ব্যক্ত ও উদ্দীপ্ত করে তুলল।

## সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯ - ১৯১২)

সখারাম ছিলেন স্বদেশী যুগের উল্লেখযোগ্য পুরুষকার। তাঁর বাড়ী ছিল বোম্বাই এর রত্নগিরি জেলার দেউস গ্রামে। জন্ম বিহারের বৈদ্যনাথ ধামের নিকট। সংঘর্ষময় জীবন ছিল তাঁর। ১৮৯০ এ এসে যোগ দিলেন কলকাতার 'হিতবাদী' পত্রিকার অফিসে। ঐ পত্রিকার প্রুফ রিডার থেকে সম্পাদক হন তিনি। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কর্মীদের সাথে তিনি পাঠ চক্রের ক্লাস নিতেন ও সমাজতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করতেন। ১৯০২ এর মার্চ মাসে প্রমথ মিত্রের সভাপতিত্বে কলকাতার অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়। সখারাম সেখানে অন্যান্য - দের সাথে ইতিহাস, ধর্ম-নীতি, রাজনীতি নিয়ে শিক্ষকতা করতেন। অরবিন্দ, নিবেদিতা, বিবেকানন্দ এবং জাতীয় স্তরের অন্যান্য নেতাদের সাথে সখারাম দেউস্করের প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল।

তাঁর উল্লেখযোগ্য বই হল 'দেশের কথা', 'শিবাজী দীক্ষা', 'শিবাজী', 'বঙ্গীয় হিন্দু জাতি কি ধ্বংসোন্মুখ'। তাঁর 'দেশের কথা' বইটি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্বল্প দিনের মধ্যে চারটি সংস্করণ বের হয়। বইটি পরে নিষিদ্ধ হয়েছিল। এই বইটি সম্পর্কে কালীচরণ ঘোষ লিখছেন " এটি ১৯০৪ জুন ১৬ই তারিখে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। খুন খারাপি, হাঁক - ডাক, উদ্দাম উত্তেজনার বালাই কিছুই ছিল না বইখানিতে। কি ভাবে ইংরেজ তার শাসন শোষণ নীতি সাহায্যে ভারতকে নিঃস্ব করেছে, দেশে দারিদ্র্য বাড়িয়েছে — অর্থ ও সহায় সম্বলহীন হয়ে লোক মরণের পথে চলেছে – এটা ছিল পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়। বিদেশীর কূটবুদ্ধিতে, দেশের শিল্প - বানিজ্যের অবনতি হেতু ইংরেজের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা উদ্রিক্ত হয়ে, দেশ যাতে নিজ শক্তির উপর নির্ভর করতে পারে তারই কথা ছিল প্রচুর। " ৬৮

' দেশের কথা ' য় সখারাম বিভিন্ন ভাবে ভারতবাসী শোষিত হওয়ার চিত্র তুলে ধরেছিলেন। "ইংরাজ চরিত্রে গুনের ন্যায় কতিপয় গুরুতর দোষও বিদ্যমান। কুটিলতা, স্বার্থপরতা, অহংকার ও বিজাতীয়ের প্রতি ঘৃণা প্রভৃতি তাহাদিগের দোষ সর্বত্র ইংরাজ চরিত্রের এই সকল দোষে আমাদিগের সামান্য উপকারও সাধিত হয় নাই। ভারতবাসীর সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ও ধর্মগত বিশেষত্ব রক্ষার পক্ষে ইংরাজের এই সকল দোষ বিশেষ সহায়তা করিতেছে। বিজেতার সহিত সম্পূর্ণ সম্মিলন, কখনই বিজিত দিগের মঙ্গলকর নহে। আকবরের সময়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিবাহাদি প্রচলিত হওয়ায় শৌর্যশালী রাজপুত জাতির কিরূপ অধোগতি হইয়াছিল তাহা ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। হিন্দু ইউরোপীয়ানদের মধ্যে শোণিত সম্বন্ধ স্থাপন মঙ্গলকর হইবে বলিয়া পূর্বে অনেকে মনে করিয়াছিলেন, অনেক অনুকরণ প্রিয় সংস্কারক এই প্রথার প্রবর্তনের জন্য নাচিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাদিগের অনেকেরই চক্ষু ফুটিতেছে। ইংরাজ চরিত্রের বিজাতি বিদ্বেষই যে এই ঘটনার কারণ, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ..... বর্তমান কালে ইংরাজদিগের অহঙ্কার, স্বার্থপরতা ও নেটিভ বিদ্বেষের ফলে হিন্দু মুসলমানের ক্রমশঃ অবস্থান্তর ঘটিতেছে। .... তাঁহাদিগের হস্তে ব্যক্তিগত ভাবে ভারতবাসীকে পদে পদে লাঞ্ছিত হইতে হইতেছে। ঘরে বাহিরে, পথে ঘাটে, চারিদিকে এই অপমান ও লাঞ্ছনার দৃশ্য ভারতবাসী সর্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছে। ইহার ফল ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ জাতীয় ইতিহাসে কোন না কোন আকারে নিশ্চিত পরিদৃষ্ট হইবে।" ৬১

পরাধীন ভারত দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে ভারত মাঝে মাঝেই পতিত হতো। দুর্ভিক্ষের এই কারণ ছিল ইংরাজ শাসন। সখারাম এই দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে গিয়ে মন্তব্য করছেন" ভারতীয় দুর্ভিক্ষের ইতিহাসে নেত্রপাত করিলে, দুর্ভিক্ষের সহিত আমাদের সম্বন্ধ এমেই কিরূপ ঘনিষ্ঠ হইতেছে তাহা সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধ হইবে। বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সর্বত্র এক প্রকার অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল, ইংরাজী ইতিহাসে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐ শত বৎসরের মধ্যে

ভারতে চারিবারের অধিক দুর্ভিক্ষ পাত হয় নাই। দুর্ভিক্ষের বিস্তারও এক একটি প্রদেশেই আবদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে এ দেশের ইংরাজের শাসন ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছে। দুর্ভাগ্য ক্রমে সেই সঙ্গে দুর্ভিক্ষ - রাক্ষসও আমাদের আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে। বিগত শতাব্দীর প্রথম পাদে বা ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কালে সমগ্র বৃটিশ ভারতে দশ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষ জনিত অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল। উহার দ্বিতীয় পাদে পাঁচ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। .....

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের দুর্ভিক্ষ কাহিনী অধিকতর শোকাবহ। এই পঞ্চ বিংশ বর্ষের মধ্যে এদেশে অষ্টাদশবার দুর্ভিক্ষ দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই মহানলে প্রায় ২ কোটি ৬০লক্ষ মহাপ্রাণী ভস্মীভূত হইয়াছে। ইহার মধ্যে শুধু বিগত দশ বৎসরেই এক কোটি ৯০ লক্ষ ভারত সন্তান ' হা অন্ন , হা অন্ন। ' করিয়া বিষম যন্ত্রনায় প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে। এই হৃদয় বিদারক দুর্ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে ' দুর্ভিক্ষ নিহত ' হতভাগ্য দিগকে সম্বোধন করিয়া মহামতি উইলিয়ম ডিগবী, সি.আই. ই. মহোদয় গভীর খেদ সহকারে বলিয়াছেন — 'You have died, you have died uselessly! ' তোমরা মরিয়াছ , তোমরা অনর্থক মরিয়াছ।''

পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষ কত দরিদ্র দেশ সখারাম সেই তথ্যও উল্লেখকরেছেন। মাথা পিছু বার্ষিক গড় আয় সম্পর্কে ইংরেজের ভ্রান্ত ধারণাকে তিনি খন্ডন করেছেন। তিনি লিখছেন " ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে আর্ল ক্রোমার মহাশয় গভর্নমেন্টের আদেশে ভারতবাসীর আয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে গড়ে ভারতবাসীর আয় প্রতি জনে বার্ষিক ২৭ টাকা মাত্র। সেই সময়ে পার্শী প্রবর শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে , বৃটিশ ভারতের অধিবাসীদিগের বার্ষিক আয় গড়ে জন প্রতি ২০ টাকার অধিক নহে। ইহার পর লর্ড ডাফরিনের আদেশ ক্রমে এদেশবাসীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে একবার অনুসন্ধান হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাধারণের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা সত্ত্বেও সে অনুসন্ধানের বিবরণ ও ফল এদেশের কাহাকেও জানিতে দেওয়া হয় নাই। কিছু দিন হইল মিঃ ডিগবী মহোদয়ের

চেষ্টায় উহার কতিপয় অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল অংশে এদেশের লোকের দুরবস্থার যে শোচণীয় চিত্র প্রকটিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে কোনও হৃদয়বান ব্যক্তিই অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন না। সে যাহা হউক, গত ১৯০১ সালে মার্চ মাসে লর্ড কার্জন বাহাদুর বক্তৃতা প্রসঙ্গেবলে যে, বিগত দশ বৎসরের দুর্ভিক্ষাদি জনিত অসীম ক্ষতি সত্ত্বেও ইদানীং বৃটিশ ভারতীয় প্রজার বার্ষিক আয় গড়ে জন প্রতি অনূন ৩০ টাকা হইয়াছে। কিন্তু ডিগবী মহোদয় অশেষ শ্রম সহকারে তাঁহার মতের বিশেষ ভাবে সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে সরকারী গণনায় বহুল ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে। মিঃ ডিগবীর গনণা মতে এক্ষণে বৃটিশ শাসনাধীন ভারত সন্তানের বার্ষিক আয় গড়ে পতিজনে ঊর্ধ সংখ্যায় ১৮.০৬ মাত্র।" ৭১

ভারতের অর্থনৈতিক দুর্দশায় ব্যথিত সখারাম অনুভব করেছেন "ভারতে নৈসর্গিক সম্পদ ( খনি, অরণ্য ও কৃষি জাত ধন ) আমেরিকার অপেক্ষাও অধিক। এখানকার বানিজ্যও বহু বিস্তৃত, তথাপি ভারতের অপেক্ষা অধিকতর দরিদ্র দেশ পৃথিবীতে আর নাই।

কেন এরূপ হইয়াছে, ভারত ভূমি রত্ন - গর্ভা হইলেও কেন তাহার সন্তানগণ ঘোর দারিদ্র ভোগ করিতেছে তাহার কারণ নির্দেশ স্থলে মিঃ ডিগবী বলিয়াছেন —

" ভারতবাসীর দারিদ্রের অন্যান্য কারণের মধ্যে দুইটি প্রধান। প্রথম ভারতীয় শিল্পের বিনাশ ও দ্বিতীয়, ভারতের ধন শোষণ। আমরা ( ইংরাজেরা ) ভারত - বর্ষীয় শিল্পের বিনাশ সাধন করিয়াছি ও ১৮৩৪। ৩৫ সাল হইতে ১৮৯৮ খৃঃ পর্যন্ত ( ইকনমিস্ট পত্র সম্পাদকের গনণানুসারে ) এক সহস্র কোটি মুদ্রা ভারতবাসীর নিকট হইতে আদায় করিয়াছি। এই সহস্র কোটি মুদ্রা যদি ভারতবর্ষেই থাকিত ও শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা সুদে ভারতবাসী কৃষক ও শিল্পীদিগকে ধার দিতে পারা যাইত, তাহা হইলে এত দিনে উহার পরিমাণ সুদ সহ ন্যূন কল্পে পঞ্চ সহস্র কোটি মুদ্রা হইত।"

দেউস্কর মন্তব্য করছেন " পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে নগদ প্রায় এক সহস্র কোটি মুদ্রা প্রেরিত হইয়াছে। .... যে দেশ হইতে প্রতি বৎসর এরূপ অজস্র ধারায় অর্থহানি ঘটিতে থাকে সে দেশে দশ কোটি লোক অর্ধাশনে দিন যাপন করিতে বাধ্য হইবে ইহা বিচিত্র নহে। " ৭২

ইংরাজী শিক্ষা লাভের পর যুব সমাজের বেকারত্ব ছিল ভয়াবহ। ইংরাজ প্রশাসনেরা ভারতীয়দের রাজকার্যে নিযুক্ত না করার নীতি বহুদিন যাবৎ নিয়ে চলেছিলেন। সখারাম দেউস্কর এ প্রসঙ্গে বলছেন " এ দেশের শিক্ষিত জন সাধারণ সামান্য কেরাণী গিরি করিয়াই বাধ্যকে উপনীত হইতে বাধ্য হন। উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আপনাদিগের কার্য্য দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শনের যথোচিত অবসর প্রাপ্ত হন না। এরূপ অবস্থায় দেশের যুবক সমাজ কেবল পুস্তকগত বিদ্যার সাহায্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিবে বা কার্য্য ক্ষেত্রে নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে, এরূপ আশা করা যুক্তি সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ যে দেশের বিদ্যালয় সমূহ ছাত্রদিগকে তেজস্বিতা বা অধ্যাবসায় শিক্ষা দিবার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা নাই, কীণজীবী কেরাণীকুল এবং মেডেনিউ ( রাজস্ব ), জুডিশিয়াল ( বিচার ), ইঞ্জিনীয়ারিং ( স্থাপত্য ও পূর্ত ) ও মেডিকেল ( চিকিৎসা ) বিভাগীয় নিম্ন শ্রেনীয় কর্মচারীর দল সৃষ্টি করিবার দিকেই যে দেশের শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষীয়গণের সমধিক দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়, সে দেশের যুবক সমাজ যখন অযোগ্যতার জন্য তিরস্কৃত হয়, তখন ভূত - ধাত্রী ধরিত্রীকে দ্বিধা হইবার নিমিত্ত সকাতর প্রার্থনা করিতে স্বতই প্রবৃত্তি জন্মে। খ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী অতি দুঃখেই ভারত সচিব মহোদয়কে বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে — The young man has no place in his country. অর্থাৎ স্বদেশে যুবকদিগের স্থান নাই। "

খ্রীষ্টান মিশনারীরা ভারতে ধর্ম প্রচার করতে এসে আমাদের দেশের সকল কিছু অন্ধ তামসিকতায় আচ্ছন্ন বলে অভিহিত করেন। । এই প্রসঙ্গে ইউরোপের

প্রতি দৃষ্টিপাত করার আহ্বান জানিয়ে সখারাম গণেশ দেউস্কর বলছেন " মিশনারীরা মহাশয়েরা এদেশবাসী নয় - নারীর চরিত্রে ধর্মভীরুতার অভাব ও কুসংস্কার প্রাবল্য দর্শনে বিশেষ চিন্তিত । কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে যখন দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল , তখন ইঁহারা বাইবেলের দোহাই দিয়া সেই ঘোরতর নিষ্ঠুর প্রথার সমর্থন করিতেন । ইউরোপে যখন দর্শন বিজ্ঞানের প্রথম চর্চা আরম্ভ হয় , তখন এই সু - সংস্কার সম্পন্ন খৃষ্টীয় যাজক সম্প্রদায় রাজশক্তির সাহায্যে জ্ঞানের পথ কণ্টকিত ও স্বাধীন চিন্তার দ্বার আবরুদ্ধ করিতে যথা সাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন । ইঁহাদিগেরই জন্য ইউরোপে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে , চিতার অনলে দার্শনিক ও তত্ত্বানুসন্ধাণী দিগের স্বণভস্মুর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল , ইতিহাস এ কথার অদ্যাপি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । কিন্তু পুরাতন কথার আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া যদি ইঁহাদিগের বর্তমান কার্য্য প্রণালীর প্রতি মনোনিবেশ করা যায় , তাহা হইলেও ইঁহাদিগের উদ্দেশ্যের সাধুতায় সংশয় জন্মে । যে বৈরাগ্য , শান্তি , দাস , ভীরুতা ও স্বার্থত্যাগ যীশু খ্রীষ্টের প্রধান শিক্ষা বলিয়া ইঁহারা আমাদিগের নিকট সগৌরবে প্রকাশ করিয়া থাকেন , তাহাদিগের স্বদেশে তাহার একান্ত অভাব দেখিয়াও ইঁহারা বিন্দু মাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করেন না । " ৭৩

ভারত পৃথিবীর বাজারে দ্রব্য রপ্তাণী করেও কি ভাবে নিঃশেষিত হয়ে যায় , তার এক নিদারুণ চিত্র দেউস্কর তুলে ধরেছেন । " ভারতে বাণিজ্যে আমদানী ও রপ্তাণীর মিল নাই , বহু বৎসরাবধি আমাদের আমদানি অপেক্ষা রপ্তাণী বেশী হইতেছে । গত পাঁচ বৎসরের আমদানি ও রপ্তাণীর হিসাব দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে , এই ৩৩ বৎসরের মধ্যে আমরা সর্বশুদ্ধ যত মূল্যের পণ্য আমদানি করিয়াছি , তদপেক্ষা ১১১ কোটি ১৩ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা মূল্যের অধিক পণ্য রপ্তাণী করিয়াছি । ..... আমাদের এই উদ্বৃত্ত পণ্য কোথায় যায় ? ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৬৭ বৎসর কাল মধ্যে অন্যূন ৭, ০০০ , ০০ , ০০০ টাকা মূল্যের উদ্বৃত্ত পণ্য ভারত হইতে বিদেশে গিয়াছে , কিন্তু তাহার বিনিময়ে ভারত এক কর্পদকও প্রাপ্ত হয় নাই । নব নব পণ্য

উৎপাদন করিয়াও ভারতের দারিদ্র ঘুচিতেছে না। যাহারা ধনী, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে ব্যবসায় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিতে, প্রধানতঃ ও মুখ্যভাবে, তাহাদেরই ধনাগম হইয়া আসিতেছে। মজুরী করিয়া যাহারা এই সকল ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করে, তাহাদের ধন বৃদ্ধি কখনই হয় না। বরং যাহারা খাটিয়া ধনীর ধন বৃদ্ধি করে, কোনও কোনও স্থলে তাহাদের মজুরি পর্যন্ত পূর্ণ মাত্রায় লাভ হয় না।

আমাদের ব্যবসায়ে ইংরাজ ধনী, সুতরাং লভ্যাংশ সমস্ত তাঁহাদের। দেশে রেলপথের বিস্তারের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের যতই বিস্তার হইতেছে, ততই ইংরাজের ধন বাড়িতেছে, আর আমরা একেই ধনহীন হইতেছি। রেলপথ এ দেশের ধন হরণের একটি প্রধান উপায় হইতেছে।" ৭০

'মুর্শিদাবাদ' পত্রিকাতে ( ২৪ই এপ্রিল, ১৯০৬ ) জনৈক পত্র লেখক লেখেন যে বইখানি পড়লে, ইংরেজদের স্বার্থপরতা নীচতা ও কাপুরুষতা কত নিম্নস্তরে নামতে পারে তার একটা ধারণা করা যায়।" ৭৪

'দেশের কথা' পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

অরবিন্দ বলছেন এই পুস্তক সম্পর্কে, "The word Swaraj was first used by the Bengali Maratha publicist, Sakharam Ganesh Deuskar, the writer of Desher Katha, a book compiling all the details of India's economic servitude which has enormous influence on the young men of Bengal and helped to turn them into revolutionaries". ৭৫

অরবিন্দ আরও বলছেন, This book had immense repercussion in Bengal, captured the mind of young Bengal and assisted more than anything else in the preparation of Swadeshi Movement". ৭৬

রবীন্দ্র নাথ ১৩১১এর শ্রাবণ সংখ্যায় ' বঙ্গদর্শনে ' ' দেশের কথা 'র সমালোচনা করেন । রবীন্দ্র নাথ স্বদেশ প্রেমের সংকীর্ণতাকে সমর্থন করতে পারেন নি ।

' শিবাজীর দীক্ষা ' ও ' শিবাজী ' দুটি পুস্তকই চরিত কথা । তিলকের নেতৃত্বে একদিন ' শিবাজী উৎসবের ' ঢেউ সারা দেশে বয়ে গিয়েছিল , সখারাম সেই ঢেউকে বাংলায় প্লাবিত করেছিলেন । ' শিবাজী উৎসবের ' পটভূমিকায় তিনি এই দুটি বই রচনা করেন । শিবাজীর ভাবাদর্শে জাতিকে সঞ্জীবিত করার আদর্শ ছিল তাঁর পুস্তকের উপজীব্য বিষয় বস্তু । রবীন্দ্র নাথের ' শিবাজী উৎসব ' কবিতাটি শিবাজীর দীক্ষা পুস্তকে সংযোজিত হয় । অরবিন্দ এই প্রসঙ্গে বলেছেন,One of the ablest men in these revolutionary groups was a Mahratta named Sakharam Ganesh Deuskar who was an able writer in Bengali and who had written a popular life of Shivaji in Bengali in which he first brought in the name of Swaraj, afterwards adopted by the Nationalists as their word for independence. Swaraj became one item of the four fold Nationalist programme." ৭৭

' হিন্দু জাতি কি বাংলা [20] ধ্বংস প্রাপ্ত হচ্ছে ? ' এই প্রশ্ন সেদিন কিছু লোকের মুখে মুখে ফিরত । কিন্তু বাংলার হিন্দুদের প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করার জন্যই তিনি রচনা করেন ' বঙ্গীয় হিন্দু জাতি কি ধ্বংসোন্মুখ ? ' এবং তিনি প্রমাণ করেন দারিদ্র্যের পথে বঙ্গ - হিন্দু মোটেই ধাবিত নয় ।

সখারাম গণেশ দেউস্কর ন্যাশনাল কলেজে অধ্যাপনা করতেন । তিনি সরকারের বিষদৃষ্টিতে পড়ার পর তাঁকে ঐ কাজ ছাড়তে হয় । তাঁর সঙ্গে আরও দুজন অধ্যাপক ইস্তফা দেন । তাঁরা হলেন বাবু রাম বিষ্ণু গঙ্গাধর ও বাজপাই । সখারাম 'দেশের কথা' বাজেয়াপ্ত করার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেন । গ.র.দাস

পেশায় নিয়োজিত থাকলেও ন্যাশনাল কলেজের সভায় সখারামকে সমর্থন করেন ।

"In connection with recent government orders proscribing two books S.G.Denskar entitled 'Desher Katha' and 'Tilaker Mokardama', the commissioner of police reports that he has received information that a meeting of National council of Education was held to consider the question of Pandit Sakharam's connection with the Bengal National College of which he is a professor. Babu Hirendra Nath Dutta, Brojendra K.Roy Chowdhury Sir Gurudas Banerjee and T.Palit were among those present. T. Palit, a retired Barrister, suggested that, in the circumstance it was inadvisable that Sukharam should continue to work in the college and proposed that he be granted leave for 6 months on half pay. To this Sukharam did not agree. He said he would resign if the committee so desired. Hirendra Babu approved his resignation and said that if this course was accepted on he would withdraw his donation from the college funds. Brojendra K Kishore supported Hirendrababu. When the question was put to vote, Sir Gurudas Banerjee voted with Hirendrababu and T. Palit's proposal was defeated.[৭৮]

পরে সখারাম বাংলা ছেড়ে চলে যান । গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্টে তার স্বীকৃতি আছে ।

## বারীন্দ্র কুমার ঘোষ

বারীন্দ্র ছিলেন অরবিন্দের ভাই। আজন্ম বিপ্লবী। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'বর্তমান রণনীতি'। যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বারীন্দ্রকে একটি বই দেন। বইটির নাম Modern weapons and Modern Warfare'. বইটি লিখে-ছিলেন J.S. Bloch। আধুনিক নানা ধরণের ছোট বড় মারণ অস্ত্র, সেনা বিভাগের নানা অংশের এবং যুদ্ধে ব্যবহার যোগ্য যন্ত্রপাতির নাম, সৈন্য সজ্জার বিধি ব্যবস্থা, কায়দা কানুন, আক্রমণ ও প্রতিরোধ বিভাগের কার্য্য কলাপ, গেরিলা যুদ্ধের রীতি নীতি এই ধরণের নানা রূপ তথ্য ও ছবির আকর্ষণে বইটি পূর্ণ ছিল। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯০৭ এর ৭ই অক্টোবর।

'বন্দেমাতরম' পত্রিকা বইটির দীর্ঘ সমালোচনা বার করে। 'বন্দেমাতরম' এর উক্তি 'The book is a small manual which seeks to deseribe for the benefit of those....who are entirely unaquainted with the subject, the nature and use of modern weapons, the meaning of military terms, the use distribution of the various limbs of a modern army, the broad principles of gnerilla warfare. These are freely illustrated by detailed references to the latest modern wars, the Boer and the Russo-Japanese, in the first of which many new developments were brought to light or tested and in the second corrected by the experience of a greater field of warfare under modern conditions. This book is a new departure in Bengali literature and one which shows the new trend of national mind"." ৭৯

বর্তমানে বইটির বাংলা কপি দুষ্প্রাপ্য। বইটি ১৯১০ সালের ৩০শে এপ্রিল সরকারী আইনে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।

রাইটার্স বিল্ডিং এর আর্কাইভস - এ যে বইটি আছে সেটা বাংলার ইংরাজী অনুবাদ। 'বর্তমান রণনীতি'র প্রকাশক ছিলেন অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ( আর ভালিয়া, ২৪ পরগণা ) এবং মুদ্রক হলেন বিভূতি ভূষণ রায়। প্রকাশনার তারিখ ২০ শে আশ্বিন, ১০১৪।

'বর্তমান রণনীতি' বইটি দুই খন্ডে লেখা। প্রথম খন্ডে ছিল ৫টি অধ্যায় এবং দ্বিতীয় খন্ডে ৮টি।

প্রথম খন্ডের অধ্যায় : –

i. War is the rule of creation.
ii. An account of the weapns of this age.
iii. Nomenclature, a nd the Armdry
iv. Body and limbs of the Army.
v. Stategy.

দ্বিতীয় খন্ডের অধ্যায়গুলি : –

i. Last half of strategy.
ii. Tactices of the offensive side.
iii. The real form of modern Warfare
iv. Attack
v. Tacties of the cavalry
vi. Captains(Officers) are the leaders
vii. Guerills mode of fighting at last turns into regular made of warfare.
viii. Whether fair or unfair (Source Records preserved in State Archives, writers' Building Calcutta) ৮০

পরবর্তীতে আলিপুর বোমার মামলার কেসে বারীন্দ্র নাথ ঘোষের দ্বীপান্তর ও কারাবাস হয় ।

## অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অবিনাশ ভট্টাচার্য্য ছিলেন বারীন্দ্রের সহযোগী । বিপ্লববাদে বিশ্বাসী। তাঁর লিখিত ' মুক্তি কোন পথে ? ' স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলেও এটা ছিল ' যুগান্তরে ' প্রবন্ধের নির্বাচিত সকলন । বইটি বর্তমানে কোথাও পাওয়া যায় না । ১৯০৭ সালে জানুয়ারীতে ( ১৩১৩ এর ১লা মাঘ ) এটি প্রকাশিত হয় ।

কালী চরণ ঘোষ এই পুস্তক সম্পর্কে লিখছেন " অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের জন্য মনোবল সৃষ্টি করার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল । বিদেশী রাজা আমাদের আনুগত্য দাবী করতে পারে না । ধমনীতে এক বিন্দু আর্য্য - শোণিত প্রবাহিত থাকলে , অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাকে নিষিক্ত করতে হবে । বিপ্লবের প্রচার - কার্য্যের জন্য সমিতি , সাহিত্য , যাত্রা , কথকতা , গুপ্ত সমিতির স্থাপন প্রয়োজন । অস্ত্র ও ধন সংগ্রহ , যুদ্ধের প্রস্তুতির , অন্য মতবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা , জাতির জাগরণের জন্য বিদেশীর হাতে নির্যাতনের প্রয়োজনীয় - তার কথা লেখা হয়েছে । জীবন উৎসর্গ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে । আরও বলা হয়েছে বিদেশী সেনা বিভাগ থেকে সৈন্য তাড়িয়ে নেওয়া খুবই কষ্টকর ব্যাপার নয় । যুদ্ধের প্রেরণা , নিশ্চিত জয়ে বাঙালীকে উন্মাদনা পূর্ণ করার নানা প্রবন্ধে বইখানি পূর্ণ ছিল । " ৮১

' মুক্তি কোন পথে ? ' সম্পর্কে এক সমালোচক বলছেন , " যুগান্তরের চোখা চোখা লেখা গুলি সংকলন করে বই বেরুলো ' মুক্তি কোন পথে ? ' .... বইয়ে জনমত গঠন এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ দ্বারা বৈপ্লবিক পরিকল্পনা ঘোষিত । অস্ত্র সংগ্রহের অর্থ জোগাড় করতে হলে ডাকাতি করতে হবে । সানন্দে জানানো হয় ট্রিগার টেনে কোনো ইউরোপীয়কে নিকেশ করতে তো বেশি গায়ের জোরের দরকার হয় না , বোমা তৈরী করতেই বা অসুবিধা কি ? শাসকগণ চমৎকৃত হয়ে শুনেছিলেন , মুক্তি কোন পথের সাধনীরা সৈন্য বাহিনীর কাজেও হাজির হতে ইচ্ছুক । ও ক্ষেত্রে শুভ ফল অবধারিত , কেননা দেশীয় সৈন্যরা পেটের দায়ে সৈনদলে ঢুকলেও এদেশের মানুষ , তাদেরও রক্ত মাংসের শরীর , তাদের যদি স্বদেশের দুঃখ দুর্দশার কথা ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া যায় , তাহলে তারা যথাকালে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ( যেগুলি শাসকেরা সরবরাহ করেছে ) স্বাধীনতা যুদ্ধে জেগে পড়তে পারবে । " ৮২

১৯১০ এর ৮ই আগষ্ট বইখানির প্রচার নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয় ।

## আবদুল রসুল (১৮৭২ - ১৯১৭)

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তকে পূর্ব বঙ্গের বিশাল মুসলমান সমাজ যখন স্বাগত জানিয়েছিলেন ঠিক সেই সময় জাতীয়তাবাদী অল্প সংখ্যক মুসলমান নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন - তাঁদের মধ্যে আবদুল রসুল অন্যতম । বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন স্বদেশী বয়কটের ভাবনায় যে সকল মুসলমান নেতৃবৃন্দ হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ স্বরূপ জাতির ও দেশের পক্ষে মঙ্গলময় বলে মনে করতেন তাঁরা হলেন আবুল কাশেম , আবদুল হালিম গজনভী , দীন মোহম্মদ , দেদার বকস , লিয়াকত হোসেন , আবদুল গফুর , ইসমাইল হোসেন সিরাজী এবং আবদুল রসুল ।

আবদুল রসুলের জন্ম কুমিল্লায়। পিতা মৌলবী গোলাম রসুল। ঢাকার সরকারী স্কুলেতে এন্ট্রান্স পাশ করে তিনি লিভারপুলে যান, অক্সফোর্ডে বি. এ পাশ করে তিনি বারিস্টারী পড়া শুরু করেন। এই সময় তাঁর অরবিন্দের সঙ্গে পরিচয়। এরপর দেশে প্রত্যাবর্তন ও কলকাতা হাইকোর্টে প্রাকটিস শুরু করেন। এই সময় বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো। রসুল বিরোধিতা করলেন এই সিদ্ধান্তের। স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে প্রথম সারিতে তিনি এসে দাঁড়ালেন।

" স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের পিছনে দেশবাসীর অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। দেশের লোককে শিল্প বানিজ্য গড়ার দিকে উৎসাহ দানের সঙ্গে নিজেও অশ্বিনী দত্তের সঙ্গে একটি কো - অপারেটিভ নেভি - গেশন কোম্পানী খুলেছিলেন। তাতে মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, সূর্যাকান্ত আচার্য্য, ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ জমিদারেরা যুক্ত হন। " ৮৩

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যখন বিশাল সংখ্যক ছাত্রেরা অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছে, সেই সময় ছাত্রদের এই আন্দোলন হতে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঘোষিত হলো কার্লাইল সার্কুলার ( ২২। ১০। ১৯০৫ )। এর কয়েকদিন পরে প্রতিবাদে হলো বিশাল জন সমাবেশ। বিপিন চন্দ্র পাল, পরম সুন্দর চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় এরা বিকল্প দেশীয় বা জাতীয় শিক্ষার প্রস্তাব দেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আবদুল রসুল। ৮৪ গঠিত হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। রসুল এই পরিষদের সেক্রেটারী ছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের তিনি দুবার সভা - পতিত্ব করেন। ১৯০৬ এ বরিশাল শহরে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয় এবং পরেরটিতে ১৯১২ তে চট্টগ্রামে।

" মুসলমানদের উদ্দেশ্যে রসুল তাঁর বরিশাল ভাষণে বলেন যে তাঁরা আন্দোলন হতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে সঠিক কাজ করেন নি। বিগত দিনের মুসলমানেরা এর জন্য দায়ী। সরকারের শুভ দৃষ্টিতে থাকার জন্য ও নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তারা মুসলিম জনগণের মধ্যে এই চিন্তাই প্রতিফলিত করেছে যে

বিধিদত্ত ও ন্যায় সঙ্গত সরকারের পরিপন্থী রাজনীতি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় । সরকার যা কিছু নির্দ্দেশ দেয় তা মাথা পেতে মেনে নেওয়ায় উচিত বলে মনে করেন । কারণ তাঁদের ধারণা সরকারের বিরোধীতা করা মানেই সরকারী চাকরী হতে বঞ্চিত হওয়া।" ৮

রসুল তাই আহ্বান জানিয়েছিলেন মুসলমানেরা নিস্পৃহতা ছেড়ে হিন্দুদের সাথে এক হয়ে মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য এগিয়ে আসার । 'Unless you are ready to migrate in a body Arabia, Persia, or Turkey, your political interests will ever be the same as those of the people other denominations in Bengal". ৮৬

রসুল লক্ষ্য করেছিলেন যে বঙ্গের তৎকালীন ইসলাম ধর্মী বাঙালীরা নিজেদের বাঙালী বলে মনে করে না । তাঁরা বাঙালী হিসেবে দেখে কেবল হিন্দুদের আর নিজেদের তাঁরা কেবল মুসলমান বলে পরিচয় দেয় । তিনি বলেন যে এই মনোভাব নিঃসন্দেহে অজ্ঞতা প্রসূত । কারণ বাঙালী মুসলমানেরা যে মাটিতে ভূমিষ্ঠ ও লালিত হয়েছে সে দিকে দৃকপাত না করে তারা কেবল ধর্মটাকেই বড় করে দেখেছে । তারা যে দেশেই জন্মাক বা যে ভাষাতেই কথা বলুক না কেন তারা মনে করেন দুনিয়ার মুসলমানেরা হল একটা 'নেশন' । রসুলের দৃষ্টিতে সেটা বাতুলতা মাত্র । কেন না তাহলে একজন ইংরেজ অন্য এক ফরাসী মানুষকে স্বজাতি ভুক্ত বলে মনে করতে পারে , যেহেতু উভয়েই খ্রীষ্টান । রাজা রাজার তাষণে রসুল তাই স্পষ্টই বলেন —
"We both Hindus and Mohamedans here belong to the same mother country Bengal. We are all Bengalees, though our different religions make us Hindu, Mahomedan or Christian." ৮৭

রসুল চেয়েছিলেন স্বদেশী শিল্পকে প্রাণবন্ত করতে । তাই স্বদেশী আন্দোলন তিনি মনে করতেন "to promote the industrial development of the country"

রসুল এর বক্তব্য " ভারতের সুতি বস্ত্র এক সময়ে বিদেশে বিপুল পরিমাণে রপ্তানী করা হতো । ভারতের মসলিন বস্ত্র পরিধান ইউরোপে একদিন গর্বের বিষয় ছিল । কিন্তু নিজেদের উদাসীন অবহেলায় আমরা সে সব ঐতিহ্যকে হারিয়েছি । কারণ নব্য শিক্ষায় বিলাতী সামগ্রীর প্রতি আমাদের মোহ দেশের নিজস্ব শিল্পকে বাজার থেকে হটিয়ে বিদেশী পণ্যের চাহিদা ও আমদানীকে বাড়িয়ে তুলেছে । " ৮৮

তাই তিনি বলছেন , " আইনের সাহায্যে আমরা বিদেশী পণ্যের আমদানী রুখতে অক্ষম অতএব বয়কটই আমাদের আত্ম রক্ষার মোক্ষম হাতিয়ার । তাতে একদিকে দেশের শিল্প বানিজ্য গড়ে উঠবে অন্য দিকে বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় হবে । " ৮৯

সেদিনে বাংলার উদ্বেলিত যুবকের দল রসুলের কথার প্রতিধ্বনি করে বলতো "Our daily bread is dependent upon the Swadeshi Movement."

• • • • •

## ষষ্ঠ অধ্যায়

## স্বদেশী যুগ ও সমকালীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের রচিত সাহিত্য

### " তথ্যপঞ্জী "


১। ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত – স্বামী বিবেকানন্দ , ১৩৬৪ , কলকাতা পৃ : ০

২। Manabendra Nath Roy, India in Transition, 1922 P 193.

৩। স্বামীজীর বানী ও রচনা (৭) উদ্বোধন , পৃ : ৪০

৪। ঐ (৮) পৃ : ২৪

৫। Swami Vivekananda, Patriot prophet, Bhupendra Nath Dutta Page -

৬। চিন্তা নায়ক বিবেকানন্দ পৃ :

৭। স্বামীজীর বানী ( ষষ্ঠ ) পৃ : ১৪৬

৮। পূর্বোক্ত পৃ : ২৪৮ - ৪৯

৯। পূর্বোক্ত ' পরিব্রাজক ' পৃষ্ঠা পরিচয়

১০। পূর্বোক্ত পৃ : ৮২

১১। স্বামীজীর বানী ও রচনা , পঞ্চম খন্ড , পৃ : ১৯৮ - ১৯৯

১২। ঐ ষষ্ঠ খন্ড পৃ : ০৫৯

১৩। পূর্বোক্ত পৃ : ০৬৭

১৪ । পূর্বোক্ত পৃ : ৩৮৪ - ৮৫

১৫ । পূর্বোক্ত পৃ : ৩৯৪ - ৩৯৫

১৬ । স্বামীজীর বানী ও রচনা , ৫ম খন্ড , পৃ : ২০৮

১৭ । Swami Vivekananda : Patriot Prophet Page - 335.

১৮ । পূর্বোক্ত পৃ : ১০২

১৯ । পূর্বোক্ত পৃ : ১০৩

২০ । পূর্বোক্ত Forward P-X X VI

২১ । শঙ্করী প্রসাদ বসু - বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ ( ৪র্থ ) পৃ : ১০

২২ । পূর্বোক্ত পৃ : ১৫

২৩ । পূর্বোক্ত পৃ : ২৫

২৪ । ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই , পৃ : ৯২

২৫ । বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ , (৪) পৃ : ৩৮

২৬ । ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই , পৃ : ৯২

২৭ । Earl Ranaldshay,'The Heart of Aryavarta' Page 85

২৮ । Sadition Committee's report,1918, Page 23.

২৯ । (Home (Pol) (Cont)F1 S1 100 FN - 1068/12,1912, Bengal Govtসূত্র ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই , পৃ : ৯০

৩০ । পূর্বোক্ত পৃ : ৯৪

৩১ । জাগরণ ও বিস্ফোরণ , ১ম খন্ড , পৃ : ২৪৪

৩২ । ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই , পৃ : ৯৮

৩৩ । পূর্বোক্ত পৃ : ৯৮

৩৪ ।Militant Nationalism in India, P 62.

৩৫ । পূর্বোক্ত পৃ : ১৮

৩৬ । বিপিন চন্দ্র পাল , জীবন ও সাহিত্য সাধনা – ডঃ চক্রবর্তী , পৃ : 'চ' ভূমিকা

৩৭ । বিনয় কৃষ্ণ সরকারের বৈঠকে , ১ম ভাগ , পৃ : ২২৪

৩৮ । Bipin Chandra Paul, Swadeshi and Swaraj :the rise of New patriotism, 1954, Page 124.

৩৯ । Bipin Chandra Paul and India's stuggle for Swaraj : Prof Haridas Mukherjee & U.Mukherjee P-29.

৪০ । কেদার নাথ দাশগুপ্ত সঙ্কলিত ' শিক্ষার আন্দোলন ' , ডিসেম্বর , ১৯০৫ , পৃ : ঘ - ঝ ।

৪১ । That Sinful Desire -Swadeshi and Swaraj B.C.Paul, P-63.

৪২ । Swaraj : Its Way and Means, Madrass speech, 1907, Swadeshi and Swaraj B.C.Paul P-216.

৪৩ । Verma, Modern Indian Political Thought P-368.

৪৪ । Bipin Chandra Paul, Swadeshi and Swaraj P-201.

৪৫ । বিপিন চন্দ্র পাল : জীবন সাহিত্য সাধনা , পৃ : ২৭২

৪৬ । Swadeshi and Swaraj P-76.

৪৭ । বিনয় সরকারের বৈঠকে , পৃ : ০০১ - ০০২

৪৮ । বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা , ১ম , পৃ : ২৭৪ - ৫

৪৯ । পূর্বোক্ত পৃ : ২৮০

৫০ । ' দেশের কথা ' দেশবন্ধু রচনা সমগ্র , পৃ : ১৯ -২০

৫১ । Deshbandhu Chitta Ranjan, Hemendra Nath Dasgupta Introduction by Humayan Kabir, P-Vii (New Delhi 1959)

৫২ । পূর্বোক্ত V-III

৫৩ । বিনয় সরকারের বৈঠকে , ১ম খন্ড , পৃ : ১১ ( ভূমিকা )

৫৪ । পূর্বোক্ত পৃ : ১১ ( ভূমিকা )

৫৫ । পূর্বোক্ত পৃ : ২২৯

৫৬ । শিক্ষা বিজ্ঞানের ভূমিকা , বিনয় সরকার , পৃ : ১২

৫৭ । পূর্বোক্ত পৃ : ২৪

৫৮ । বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা খন্ড পৃ :

৫৯ । ' অরবিন্দের পত্র' প্রবর্তক , ১৩২৬ , পৃ : ৬ - ১১

৬০ । শ্রী অরবিন্দের বাংলা রচনা – শ্রী অরবিন্দ আশ্রম পন্ডিচেরী – ১৯৯১ , পৃ : ১৪৪ - ৪৫

৬১ । পূর্বোক্ত পৃ : ১৪৬ - ৪৭

৬২ । পূর্বোক্ত পৃ : ১৪৯

৬৩ । পূর্বোক্ত পৃ : ১৬৭

৬৪ । পূর্বোক্ত পৃ :

৬৫ । বঙ্গভঙ্গ , সমুদ্র গুপ্ত , পৃ : ৭৫

৬৬ । পূর্বোক্ত পৃ : ৭৭

৬৭ । পূর্বোক্ত পৃ : ৭৮ -৭৯

৬৮ । জাগরণ ও বিস্ফোরণ , (১) , পৃ : ২২১ -২২

৬৯ । দেশের কথা পৃ : ৩ - ৪

৭০ । পূর্বোক্ত পৃ : ১০ -১১

৭১ । পূর্বোক্ত পৃ : ১০ -১৪

৭২ । পূর্বোক্ত পৃ : ২৫০

৭৩ । পূর্বোক্ত পৃ : ৯৫ - ৯৬

৭৪ । জাগরণ ও বিস্ফোরণ , ১ম খণ্ড , পৃ : ২২১ - ২২

৭৫ । Sri A Aurabinda on himself) P-30

৭৬ । পূর্বোক্ত পৃ : ৪৬

৭৭ । পূর্বোক্ত পৃ : ৪৬

৭৮ । ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই , পৃ : ১৪৬

৭৯ । Bandemataram, 13th October,1907.

৮০ । Source, Records preserved in State Archives
Writers' Buildings, Calcutta.

৮১ । জাগরণ ও বিস্ফোরণ , ( ১ম ) পৃ : ২২২ - ২২৩

৮২ । নিবেদিতা ও জাতীয় আন্দোলন , শঙ্করী প্রসাদ বসু , দেশ , ১৫১০ ,
১৯৮২ , পৃ : ১০

৮৩ । বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা , ১ম খণ্ড , পৃ : ২৮৯

৮৪ । অমৃত বাজার পত্রিকা , ২০ . ১০ . ১৯০৫

৮৫ । Bengal Provincial conferamce,1906,Barisal Session,
Compiled by Yatindra Nath Ghosh(1978) P-61.

৮৬ । পূর্বোক্ত পৃ : ৬৬

৮৭ । বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা , ১ম খণ্ড , পৃ : ২৯৪

৮৮ । পূর্বোক্ত পৃ : ২৯৫

৮৯ । পূর্বোক্ত পৃ : ২৯৫